আমারই কথাটাকে কেবল খুঁটি ধরে' টেনে টেনে বের করছ—নিজের কথাটিকে বরাবর বেশ ঢেকেচুকে সাম্‌লে রেখেছ। আমি যেন কেবল একটি জীবন্ত তলোয়ারের সঙ্গে লড়াই করচি—কেবল খোঁচা খাচ্চি, কাউকে খোঁচা ফিরিয়ে দিতে পারচিনে। আমি বার বার যতই বুক ফুলিয়ে ফুলিয়ে দাঁড়াচ্চি তোমার ততই আঘাত করবার সুবিধে হচ্চে। কিন্তু এটাকে কি ন্যায়যুদ্ধ বলে?

আমি ব্রাহ্মণ—কেবলমাত্র যুদ্ধের উৎসাহে আনন্দ পাইনে। আসল কথাটা কি তাই জান্‌তে পারলেই চুপ করে' যাই। আমি ত বলি সাহিত্যের উদ্দেশ্য সমগ্র মানুষকে গঠিত করে' তোলা। তুমি কি বল?—

কিন্তু তুমি শুন্‌চি কলকাতায় আস্‌চ—আমিও সেখানে যাচ্চি। তা হলে তর্কটা মোকাবিলায় নিষ্পত্তি হবার সম্ভাবনা দেখ্‌চি। কিন্তু অধিকাংশ সময়ে মোকাবিলায় নিষ্পত্তি কুইনাইন্ দিয়ে জ্বর ঠেকানোর মত। হয়ত চট্ করে' ছেড়ে যেতে পারে নয় ত গুম্‌রে গুম্‌রে থেকে যায়, আবার কিছুদিন বাদে কেঁপে কেঁপে দেখা দেয়। ইতি।

স্বরলিপি।

("মায়ার খেলা" হইতে)

রাগিনী দেশ—কাওয়ালি।

প্রমদা।— দেলো, সখি, দে, পরাইয়ে গলে
সাধের বকুল ফুলহার।

আধফুট' যুঁইগুলি
যতনে আনিয়া তুলি
গাঁথি গাঁথি সাজায়ে দে মোরে
কবরী ভরিয়ে ফুলভার!
তুলে দেলো চঞ্চল কুন্তল
কপোলে পড়িছে বারে বার!
সখি।— আজি এত শোভা কেন!
আনন্দে বিবশা হেন
বিম্বাধরে হাসি নাহি ধরে,
লাবণ্য ঝরিয়া পড়ে ধরাতলে,
সখি, তোরা দেখে যা, দেখে যা,
তরুণ তনু এত রূপরাশি
বহিতে পারে না বুঝি আর!

॥ মা রা মা পা। র্সা -া -া -া । র্সর্রা র্সঞা ধা পা।
॥ দে লো স খি। দে — — — । পরা ইয়ে গ লে।

। পধা পমা ধপা মগা। রা -া -া -া। রাঃ মঃ রা সা।
। সাধে র, ব কুল ফুল। হা — — র্। আ ধ ফু টো।

। রা সা ন্া সা। রা মা মা মা। পা পা পা পধা।
। জুঁ ই গু লি। য ত নে, আ। নি য়ে তু লি।

। মা পা না র্সা। র্সর্রা র্সঞা ধা পা। পধা পমা ধপা মগা।
। গাঁ থি গাঁ থি। সাজা য়ে,দে মো রে। কব রি,ভ রিয়ে ফুল।

। রা -া -া -া। ঞা ঞা ঞা ঞা। ঞর্সা র্সর্সা র্সা র্সর্সা।
। ভা — — র। তু লে দে লো। চ ঞ্চল কু ন্তল।

। র্সরা র্সজ্ঞা র্রর্সা ঞ্ধা। পা -া -রা -রমা ॥ মা পা না না।
। কপো লে,প ড়িছে বারে। বা — — র্ ॥ আ জি এ ত।

। {র্সা নর্সর্রা র্সনা র্সা। র্সা র্সর্রা র্সা না। র্সা নর্সর্রা র্রা র্রর্জ্ঞা।
। {শো ভা কে ন। আ ন ন্দে, বি। ব শা হে ন।

। (র্জ্ঞর্রা র্সা র্রর্সা না)।} র্সা না র্সা র্সা। র্সর্রা র্সজ্ঞা ধা ঞ্ধা।
। (আ জি এ ত)।} বি শ্বা ধ রে। হাসি নাহি ধ রে।

। পা ধপা মা ধা। ধা ঞ্ধা পা ধপা। মা মধা পা মগা।
। লা ব ণ্য, ঝ। রি য়া প ড়ে। ধ রা ত লে।

। রগমা মা মা মগা। রগা গা গা -রা। সরা রা রা -া।
। স খি তো রা। দে খে যা —। দে খে যা —।

। রমা রা মা পা। র্সা -া -া -া। র্সর্রা র্সজ্ঞা ঞ্ধা পা।
। ত রু ণ, ত। নু — — —। এত রূপ রা শি।

। পধা পমা ধপা মগা। রা -া -া -মা ॥ ॥
। বহি তে,পা রেনা বুঝি। আ — — র্ ॥ ॥

চিহ্নের ব্যাখ্যা।

১। স র গ ম প ধ ন=সপ্ত স্বর।

২। া=এক মাত্রার চিহ্ন। দুইটি কিম্বা ততোধিক স্বরাক্ষর একত্র করিয়া শেষ অক্ষরটির গায়ে আকার দিলে দুইটি অর্দ্ধমাত্রার স্বর কিম্বা কতকগুলি ভগ্নমাত্রিক স্বর একমাত্রার সামিলে আসিল এইরূপ বুঝায়; যথা পধা, রগমা ইত্যাদি। অর্দ্ধমাত্রার পৃথক্ চিহ্ন হচ্চে বিসর্গ যথা, সঃ। দেড়মাত্রা=াঃ; যথা, সাঃ।

৩। উচ্চ সপ্তকের চিহ্ন=স্বরাক্ষরের উপর রেফ্।
খাদ সপ্তকের চিহ্ন=স্বরাক্ষরের নীচে হসন্ত।

৪। ঞ=কোমল ন।

পাশের যুগল ছেদ আস্থায়ীতে ফিরিয়া যাইবার চিহ্ন। ফিরিয়া গিয়া যেখানে থামিতে হয় ও থামিয়া অন্তরা প্রভৃতি অন্য কলি ধরিতে হয় সেইখানে মাথার উপর যুগল ছেদ বসে।

গুম্ফ-বন্ধনী=বিশেষ-পুনরাবৃত্তির চিহ্ন। যেখানে এইরূপ } বিমুখী গুম্ফ-বন্ধনী দেখিবে সেইখানে ছাড়িয়া দিয়া, পূর্ব্ববর্ত্তী যেস্থানে এইরূপ { প্রমুখী গুম্ফ-বন্ধনী আছে সেইখান হইতে পুনরাবৃত্তি হইবে। পুনরাবৃত্তিকালে যেখানে এইরূপ ( ) বক্র-বন্ধনী দেখিবে সেই বন্ধনীর অন্তর্গত সুরগুলি ছাড়িয়া দিয়া তাহার পরের সুরগুলি ধরিতে হইবে। যথা, এই গানের অষ্টম পংক্তিতে "আজি এত"র পরে ছাড়িয়া দিয়া (সপ্তম পংক্তি) "শোভা কেন" হইতে ফের ধরিতে হইবে। এবং ফের যখন "আজি এত"র কাছে আসিবে তখন "আজি এত" একেবারে ছাড়িয়া দিয়া তৎপরবর্ত্তী পদের সুর "বিম্বাধরে" হইতে সুরু করিবে।

"কেন নয়ন আপনি ভেসে যায়!" *

ভৈরবী—একতালা।

কেন নয়ন আপনি ভেসে যায় (জলে)!
কেন মন কেন এমন করে!
যেন সহসা কি কথা মনে পড়ে, মনে পড়ে না গো
তবু মনে পড়ে!
চারিদিকে সব মধুর নীরব,
কেন আমারি পরাণ কেঁদে মরে!

* শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অপ্রকাশিত গান।

যেন কাহার বচন দিয়েছে বেদন,
যেন কে ফিরে গিয়েছে অনাদরে,
বাজে তারি অযতন প্রাণের পরে !
যেন সহসা কি কথা মনে পড়ে, মনে পড়ে না গো
তবু মনে পড়ে !

৩।°

। রা জ্ঞা -রমা ॥ জ্ঞা -া -লা । -সা ণ্দ্া -প্দ্া । ণ্া -সাঃ জ্ঞঃ ।
। কে ন — ॥ ন — য় । — ন — । আ — প ।
॥

। জ্ঞাঃ -লঃ -সা । সা -লা -জ্ঞমজ্ঞা । -লা -জ্ঞা লা । সা -া -া ।
। নি — — । ভে — — । — — সে । যা — য় ।

। রা জ্ঞা -রমা ॥ -া সা সণ্া । সা -া সা । -দা দা -পদপা ।
। (জ লে) — ॥ —কে ন । ম — ন । —কে — ।

। মা -া -া । ঋা -া -মঋমা । জ্ঞা -রা জ্ঞা । -রমা জ্ঞা -রা ।
। ন — — । এ — — । ম — ন । — ক — ।

। জ্ঞা -রজ্ঞা -সা । জ্ঞা রজ্ঞা -মা ॥ সা সণ্া । সা -া সা ।
। রে — — । (কে ন) — ॥ যে ন । স — হ ।

। -দা পা -া । পা -দা ণা । -া -র্সা -া । ণর্সা -র্ণা র্সা ।
। — সা — । কি — ক । — থা — । ম — নে ।

। -া র্সা -ণা । ণা -দা দা । -পা পা -মা । পা -দা পদা ।
। — প — । ড়ে — ম । — নে — । প — ড়ে ।

। -ণা ধা -পা । মা -া মা । -ঋা ঋা -মা । জ্ঞা -রা জ্ঞা ।
। — না — । গো — ত । — বু — । ম — নে ।

। -রমা জ্ঞা -রা । জ্ঞা -রজ্ঞা -সা । জ্ঞা -রজ্ঞা মা ॥ । । । ।
। — প — । ড়ে — — । (কে — ন) ॥ ।

। সা -া সা । -ণসা ণা -া । {জ্ঞা -া মা । -া মা -া । মা -া জ্ঞা ।
। চা — রি । — দি — । {কে — স । — ব — । ম — ধু ।

। -ঃমঃ জ্ঞা -া । মা -া জ্ঞা । (-ণজ্ঞণা সণা -জ্ঞমা । জ্ঞা -ণজ্ঞা ণা ।
। — র — । নী — র । (— ব — । চা — রি ।

। -সা সা -ণা) ।} -ণজ্ঞণা সা -া । -া -া -া । । সা সঋা ।
। — দি —) ।} — ব — । — — — । কে ন ।

। সা -া সা । -দা পা -া । পা -দা ঋা । -া র্সা -া ।
। আ — মা । — রি — । প — রা । — ণ — ।

। ঋর্সা -র্ণা র্সা । -া ঋা -া । দঋা -দা পা । -া পা -মা ।
। কেঁ — দে । — ম — । রে, — কে । — ন — ।

। পা -া পা । -দা পদা -ঋা । দা -পদপা মা । -জ্ঞা জ্ঞা -মা ।
। ম — ন । — কে — । ন — এ । — ম ।

। জ্ঞা -রা জ্ঞা । -রমা জ্ঞা -রা । জ্ঞা -া -সা । জ্ঞা -রজ্ঞা মা ॥
। ন — কে । — ন — । রে — — । (কে — ন) ॥

। । সা সা । সা -া সা । -ণসা ণা -া । জ্ঞা -া মা ।
। যে ন । কা — হা । — র — । ব — চ ।

। -া মা -া । মা -া জ্ঞা । -ঃমঃ জ্ঞা -া । মা -া জ্ঞমগা ।
। — ন — । দি — য়ে । —ছে — । বে — দ ।

। -ণা সণা -জ্ঞমা । জ্ঞা -মা জ্ঞা । -ণজ্ঞণা সা -ণা । জ্ঞা -া রজ্ঞা ।
। ন — । কা — হা । — র — । ব — চ ।

। -ধা মা -া। মা -া ঋদঋা। -ঃমঃ ঙ্গা -া। মা -া ঙ্গা।
। – ন –। দি – য়ে। – ছে –। বে – দ।

। -লঙ্গলা সা -া। -া -া -া। সা সঞ্‌া। {{সা -দা দা।
। – ন, –। – – –। যে ন। {{কে – ফি।

। পা পা -া। পা -া পা। -ধা পা -মা। পা -দা পদা।
। – রে –। গি – য়ে। – ছে –। অ — না।

। -ঞা দা -পা। (মা -পমা -ঙ্গা। মা -ঙ্গলা সা) ।}} মা -া মা।
। — দ —। (রে — —। যে — ন) ।}} রে, – বা।

। -ঋা ঋা -মা। ঙ্গাঃ -রঃ ঙ্গা। {{{-া ঙ্গা -রা। ঙ্গা -রা ঙ্গরা।
। — জে —। তা — রি। {{{– অ —। য — ত।

। -মা ঙ্গা -মঙ্গা। সা -লা ঙ্গা। মঙ্গা লা -ঙ্গলা। (সা -া রা।
। — ন –। প্রা – ণে। র প –। (রে – বা।

। -া ঙ্গা -রা। ঙ্গা -রপা মা) ।}}} সা -া -া॥
। — জে — । তা – রি) ।}}} রে, – –॥

চিহ্নের ব্যাখ্যা।

১। ঞ=কোমল ন; ল=কোমল র; দ=কোমল ধ; ঙ্গ=কোমল গ; ঋ=কড়ি ম।

২। গানের মধ্যে ক্ষণিক বিশ্রামের নাম বিরাম। একমাত্রা কালস্থায়ী বিরামের চিহ্ন হচ্ছে হাইফেন্-বিবর্জ্জিত আকার। যথা, এই গানের পঞ্চম পংক্তিতে। ।।।।। পূর্ব্বে আমরা ঐ স্থলে শূন্য বসাইতাম। এইক্ষণে তাহার এইরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

৩। এই গানটির স্বরলিপি সা-খরাজ বসান হইয়াছে কিন্তু মা-খরজে গাইলে ভাল শুনায়।

গোবিন্দদাস।

যাঁহারা প্রাচীন বৈষ্ণব কবিদিগের গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়াছেন, গোবিন্দদাসের নাম তাঁহাদের নিকটে সুপরিচিত। রাধাকৃষ্ণ ও গৌরাঙ্গলীলা-সম্পর্কিত অনেকগুলি পদাবলীতে গোবিন্দদাসের ভণিতা দেখিতে পাওয়া যায়। গোবিন্দদাসভণিত কোন কোন কবিতা এতই মধুর যে তাহা চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির সমতুল্য বলিয়া বোধ হয়। গোবিন্দদাসের পদাবলী একটু নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করিলে সহজেই অনুমিত হয় যে, গোবিন্দদাস অনেকস্থলে বিদ্যাপতির ভাষা পর্য্যন্ত অনুকরণ করিয়াছেন। এই গোবিন্দদাস সম্বন্ধে নানা কথা শুনিতে পাওয়া যায়। কেহ বলেন গোবিন্দদাস নামে চারিজন ব্যক্তি পদরচয়িতা ছিলেন; কেহ বলেন ছয়জন। আজ পর্য্যন্ত এ বিষয়ের কিছুই মীমাংসা হয় নাই। কোন কোন ব্যক্তির মতে একজন গোবিন্দদাস, চৈতন্যদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী ও চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির সমসাময়িক ছিলেন। ১২৮২ সালের "বান্ধব" পত্রিকায় "গোবিন্দদাস" শীর্ষক প্রবন্ধে এই মত বিশেষরূপে সমর্থিত হইয়াছে। উক্ত প্রবন্ধে গোবিন্দদাস সম্বন্ধে এমন কতকগুলি ভ্রমাত্মক মত প্রকটিত হইয়াছে, যাহাতে গোবিন্দদাসের প্রকৃত ইতিহাস অধিকতর কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং উক্ত প্রবন্ধের ভ্রমপ্রদর্শন আবশ্যক। বিবিধ বৈষ্ণবগ্রন্থ ও মহাজনপদাবলী আলোচনা করিয়া গোবিন্দদাস সম্বন্ধে আমরা

যাহা অবগত হইতে পারিয়াছি, তাহা "সাধনায়" প্রকাশ করা যাইতেছে।

প্রবন্ধলেখক বলেন, "গোবিন্দদাস নামে সর্ব্বশুদ্ধ নয় ব্যক্তির নাম বৈষ্ণব গ্রন্থে দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে ছয়জন পদাবলীরচয়িতা।" এই ছয়জনের প্রথম ব্যক্তির সম্বন্ধে কোন "আষাঢ়ে গল্প"-মূলক প্রবাদের উপর নির্ভর করিয়া তিনি বলিয়াছেন যে, "কাষ্ঠগড়ের (কাটোয়ার) উত্তরস্থিত প্রসিদ্ধ ঝামটগ্রামের নিকট-বর্ত্তী বনপাড়া নামক ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে গোপাল চক্রবর্ত্তী নামে এক ব্যক্তি বাস করিতেন, গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী তাঁহারই ঔরস পুত্র।" এই গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীকেই প্রবন্ধলেখক বিদ্যাপতি ও চণ্ডী-দাসের সমসাময়িক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সমুদায় প্রাচীন বৈষ্ণবগ্রন্থে কাটোয়ার নাম "কণ্টক নগর" লিখিত হইয়াছে; "কাষ্ঠগড়" কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়তঃ "ঝামট" নামে কোন গ্রামের বিষয় আমরা অবগত নহি। তবে কৃষ্ণ-দাস কবিরাজ গোস্বামীর জন্মভূমির নাম "ঝামটপুর" এবং তাহা কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী। এই গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী যে, গৌরা-ঙ্গের পূর্ব্ববর্ত্তী বিদ্যাপতি প্রভৃতির সমকালীন লোক ছিলেন, তৎসম্বন্ধে লেখক একটী অদ্ভুত প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াছেন। যথা— "গোবিন্দদাস কৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থেরও প্রণেতা, উক্ত গ্রন্থখানি চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির পদাবলীর ন্যায় যে অত্যন্ত প্রাচীন ও গৌরাঙ্গের প্রিয়বস্তু ছিল নিম্নলিখিত কবিতা তাহার প্রমাণ।

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটক গীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্র দিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ॥"
চৈতন্যচরিতামৃত।

"কৃষ্ণকর্ণামৃত" গ্রন্থ ভক্তবর বিল্বমঙ্গল ঠাকুর কর্তৃক সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। চৈতন্যদেব যখন তীর্থভ্রমণে বহির্গত হইয়া হায়দ্রাবাদ অঞ্চলে কৃষ্ণা নদীতীরে উপনীত হয়েন, সেই সময়ে তত্রত্য বৈষ্ণবগণের নিকটে "ব্রহ্মসংহিতা" ও "কৃষ্ণকর্ণামৃত" গ্রন্থ দেখিতে পান এবং তাহা সংগ্রহ করিয়া লয়েন। * "চৈতন্যচরিতামৃত" গ্রন্থের স্থানে স্থানে কর্ণামৃতের অনেক শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। লেখক মহাশয়ের আর একটী যুক্তি এই যে, বিদ্যাপতির কোন কোন কবিতার শেষে গোবিন্দদাসের নাম দেখিতে পাওয়া যায়, সুতরাং তাঁহার মনে সহসা এই বিশ্বাসেরই উদয় হইয়াছে যে, গোবিন্দদাস ও বিদ্যাপতি উভয়ে "অনেক পদ একত্রে রচনা করিয়াছেন।" লেখক গোবিন্দদাস নামযুক্ত বিদ্যাপতির এই কয়েকটী পদাংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

"ভণয়ে বিদ্যাপতি গোবিন্দদাস তথি
পূরল ইহ রস ওর।"

পুনশ্চ

"বিদ্যাপতি কহে নিকরুণ মাধব
গোবিন্দদাস রসপুর।"

গোবিন্দদাসের আরও দুইটী কবিতাতে রাজা বৈদ্যনাথ ও রূপনারায়ণের নাম সংযুক্ত দেখা যায়।

---

* তবে মহাপ্রভু আইলা কৃষ্ণবিন্নাতীরে।
নানা তীর্থ দেখি তাঁহা দেবতা মন্দিরে॥
ব্রাহ্মণ সমাজ সব বৈষ্ণব চরিত্র।
বৈষ্ণব সকল পড়ে কৃষ্ণকর্ণামৃত॥
কর্ণামৃত শুনি প্রভুর আনন্দ হইল।
আগ্রহ করিয়া পুঁথি লেখাইয়া লৈল॥
চৈতন্যচরিতামৃত। মধ্যখণ্ড ৯ম পরিচ্ছেদ।

"কমল নীত চরণকমল মধু
পাওয়ে যো সোই সুজান।
রাজা বৈদ্যনাথ রূপনারায়ণ
গোবিন্দদাস অনুমান॥"
"লোচন খঞ্জন জগতজনরঞ্জন
কুলবতী যুবতী বরত ভয়ভঞ্জন।
গোবিন্দদাস ভণ রসিক রসায়ণ
রসময় ভূপতি রূপনারায়ণ॥"

আমরা প্রথমেই বলিয়াছি, গোবিন্দদাস অনেক স্থলেই বিদ্যাপতির অনুকরণ করিয়াছেন; এই কারণে তাঁহার কবিতাতে হিন্দী ও হিন্দীসম শব্দের অধিকতর প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। কেবল গোবিন্দদাস নহে, পরবর্ত্তী প্রায় সমুদায় বৈষ্ণব কবিই অল্লাধিক পরিমাণে বিদ্যাপতির ভাষা ও ভাব গ্রহণ করিয়াছেন। বিদ্যাপতি প্রভৃতির ভণিতাসম্বলিত উপরোক্ত কবিতাগুলি গোবিন্দদাসের রচিত, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

রায়বসন্ত ও গোবিন্দদাস ভণিতাযুক্ত

"রায়বসন্ত মধুপ আনন্দিত
নিন্দিত দাস গোবিন্দ।"
"রায়বসন্ত মধুপ অনুসন্ধিত
বঞ্চিত দাস গোবিন্দ।"

এই পদাংশ দেখিয়া লেখক মহাশয় বলিতেছেন যে, "অনেকে বিদ্যাপতি ও রায়বসন্তকে একই ব্যক্তি বলিয়া জ্ঞান করেন, তাহাই হউক বা উঁহারা সমসাময়িকই হউন, তাহাতে কিছু আসে যায় না। সুতরাং লেখক মহাশয়ের মতে গোবিন্দদাস নিশ্চয়ই বিদ্যাপতির সমকালীয় ও চৈতন্যদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু রায়বসন্ত ও বিদ্যাপতি যে এক ব্যক্তি না

হইলেও তাঁহাদিগকে সমসাময়িক হইতেই হইবে, এরূপ কোন বাঁধা নিয়ম নাই; বোধ হয় পাঠক মহাশয়গণ তাহা স্বীকার করিতে বিশেষ আপত্তি করিবেন না। কিন্তু প্রবন্ধলেখক মহাশয় গোবিন্দদাসকে বিদ্যাপতির সমকালবর্ত্তী বলিয়া বিশ্বাস করিতে এতই ব্যতিব্যস্ত যে, যুক্তি প্রমাণের উপর নির্ভর না করিয়া হঠাৎ বলিয়া বসিলেন, ইহাঁরা সকলেই একস্থানবাসী, এক সময়ের লোক এবং ইহাও অসম্ভব নয় যে, সকলেই এক রাজপরিবারস্থ ব্যক্তি ছিলেন। বোধ হয় তন্মধ্যে বিদ্যাপতি শিবসিংহের সভাসদ্,এবং গোবিন্দদাস রূপনারায়ণ ও বৈদ্যনাথের সভাসদ ছিলেন। যাঁহারা বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস কিছুমাত্র আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই অবগত আছেন যে, চণ্ডীদাসের জন্মস্থান বীরভূম জেলার অন্তর্গত নান্নুরগ্রাম, আর বিদ্যাপতি মিথিলানিবাসী। পরন্তু শিবসিংহ ও রূপনারায়ণ দুইজন পৃথক্ ব্যক্তি নহেন, শিবসিংহের পূর্ণ নাম "রূপনারায়ণ পদাঙ্কিত মহারাজ শিবসিংহ।" ১২৮২ সালের জ্যৈষ্ঠসংখ্যক বঙ্গদর্শনে পণ্ডিতবর ৺রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিদ্যাপতির জীবনচরিতে লিখিয়াছেন যে, বিদ্যাপতির বংশধরগণ অদ্যাপি মিথিলা প্রদেশস্থ বীসপী গ্রামে বাস করিতেছেন। বিশেষ জিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণ উক্ত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া দেখিবেন।

লেখকমহাশয় একস্থানে বলিয়াছেন, "অতএব আমরা এই প্রস্তাবে গোবিন্দদাস সম্বন্ধে যথার্থ তত্ত্ব প্রকটন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।" তিনি কিরূপ "যথার্থ তত্ত্ব প্রকটন" করিয়াছেন, আমরা যথাসাধ্য তাহার সমালোচনা করিতে চেষ্টা করিলাম।

গোবিন্দানন্দ ভাগবত, গোবিন্দ দত্ত ও গোবিন্দ ঘোষ এই তিন ব্যক্তিকেই লেখক মহাশয় এক একজন স্বতন্ত্র পদকর্ত্তা

বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বৈষ্ণবগ্রন্থে ইঁহাদের কেবল নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তদ্ব্যতীত বিশেষ বিবরণ কিছুই অবগত হওয়া যায় না। চৈতন্যদেব যখন নবদ্বীপে শ্রীবাসের অঙ্গনে নিশাকীর্ত্তন ও সন্ন্যাস-ধর্ম্ম অবলম্বনের পর নীলগিরিতে সপ্ত সম্প্রদায়ে মিলিত হইয়া মহাসংকীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তখন গোবিন্দানন্দ ও গোবিন্দদত্ত শিষ্যরূপে তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া হরিনাম কীর্ত্তন করিতেন। গোবিন্দানন্দ একজন মহাভাগবত ও গোবিন্দদত্ত প্রধান কীর্ত্তনগায়ক ছিলেন। বাসু ঘোষের ন্যায় ইঁহারা স্বরচিত পদ গান করিতেন কি না তাহার কোনও প্রমাণ নাই, অথচ লেখক দুইটী পদ উদ্ধৃত করিয়া, তাহার প্রথমটী গোবিন্দানন্দের ও দ্বিতীয়টী গোবিন্দদত্তের বলিয়াছেন। লেখক বলিতেছেন, "গোবিন্দানন্দ চৈতন্যের প্রেমোন্মাদ দর্শনে ব্যাকুল হইয়া কহিতেছেন, 'পুলকে পূরল তনু নিজগুণ শুনি' ইত্যাদি। এবং "ইনি (গোবিন্দ দত্ত) একজন কীর্ত্তনীয়া ছিলেন, ইহাঁর স্বরচিত অনেকগুলি পদও মনোহর, কিন্তু তৎসমুদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক একটী অনুপ্রাসপূর্ণ পদ উদ্ধৃত করিতেছি। এরূপ করিবার কারণ পদটী পাঠ করিলেই পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন।" লেখকের অভিপ্রায় কি আমরা তাহার কিছুই মর্ম্মবোধ করিতে পারিলাম না। যাহা হউক পদটীর ভণিতাটুকু আমরাও উদ্ধৃত করিতেছি।

গোয়স গাহি গিরীশ্বরনন্দন
গাওত দাস গোবিন্দ।

এই ভণিতায় গিরীশ্বরনন্দন গোবিন্দের নাম আছে, সুতরাং ইনি যে একজন গানরচয়িতা তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু উপ-

রোক্ত দুইটী পদ গোবিন্দানন্দ ও গোবিন্দদত্তের রচনা, লেখক তাহা কি উপায়ে জানিতে পারিলেন ?

তৎপরে গোবিন্দ ঘোষ। লেখক ইহাঁকেও একজন গোবিন্দ-দাস নামে পরিচিত করিয়াছেন। ইহাঁরা তিন ভাই,—গোবিন্দ, মাধব ও বাসুঘোষ চৈতন্যের প্রিয় সহচর ছিলেন। নীলাচলে সংকীর্ত্তনের সময় গোবিন্দ ঘোষ একটী গায়কসম্প্রদায়ের অধিনায়কতা করিয়াছিলেন। নিত্যানন্দ চৈতন্যের আদেশে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম প্রচারার্থ নীলাচল হইতে বঙ্গদেশে আগমন করিলে মাধব ও বাসুঘোষ তাঁহার সঙ্গে আইসেন; গৌরগতপ্রাণ গোবিন্দ নীলাচলে প্রভুর নিকটেই ছিলেন। ইহাঁরা তিনজনে সঙ্গীত সংকীর্ত্তনের দ্বারা বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারের বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। বাসুঘোষের রচিত চৈতন্যলীলা সঙ্গীত তৎকালে ভক্তসমাজে আদরপূর্ব্বক গীত হইত। গোবিন্দ ঘোষ রচিত দুই চারিটী কবিতা বা গান শুনিতে পাওয়া যায়। লেখক তাহার একটী উদ্ধৃত করিয়াছেন। পদটীর শেষ চরণ এই—

শুনিয়া মুকুন্দ কান্দে হিয়া থির নাহি বাঁধে
গদাধরে বদন হেরিয়া।
এ গোবিন্দ ঘোষে কয় ইহা যেন নাহি হয়
তবে মুঞি যাইব মরিয়া।

"এ গোবিন্দ ঘোষে কয়" ইত্যাদি বাক্যে রচয়িতা গোবিন্দ ঘোষ নামে স্পষ্টরূপে আপনার পরিচয় দিয়াছেন। এতদ্দেশে ইনি "ঘোষঠাকুর" নামে প্রখ্যাত। কেহ কেহ বলেন, ইঁহার জন্মস্থল বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত যৌগ্রামকুলীনগ্রাম। যেখানে হউক, বৃদ্ধাবস্থায় ইনি অগ্রদ্বীপে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। অদ্যাপি অগ্রদ্বীপে প্রতিবর্ষে "ঘোষঠাকুরের" তিরোভাব উপ-

লক্ষে মেলা হইয়া থাকে। অগ্রদ্বীপ বৈষ্ণবদিগের একটী প্রধান তীর্থস্থান। * এই সকল কারণে অন্যান্য বৈষ্ণব-বাবাজী অপেক্ষা বরাবর ইঁহার স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। ইনি স্বনাম-বিখ্যাত পদকর্ত্তা ও সাধু বৈষ্ণব বলিয়া প্রসিদ্ধ।

শ্রীনিবাস আচার্য্যের পুত্র গোবিন্দ আচার্য্যকে প্রবন্ধলেখক অন্যতম গোবিন্দদাস বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন, "মালী-হাটী গ্রামে ইঁহার বাসস্থান ছিল। ইনিও গৌরাঙ্গের পরমভক্ত ও প্রিয়পাত্র ছিলেন।" শ্রীনিবাস আচার্য্যের বিবরণ জ্ঞাত থাকিলে লেখক এপ্রকার ভ্রমে পতিত হইতেন না। "নরোত্তমবিলাস" ও "ভক্তিরত্নাকর" গ্রন্থে ইঁহার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ভাগারথী-তীরস্থ চামুন্দিয়া গ্রামে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণবংশে শ্রীনিবাস জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতা চৈতন্যের অনুগত ভক্ত ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পরে ইনি কাটোয়ার অন্তঃপাতী জাজিগ্রামে মাতামহাশ্রয়ে গিয়া বাস করিয়াছিলেন। শ্রীনিবাস পিতৃসন্নিধানে গৌরাঙ্গের অপূর্ব্ব মহত্ত্ব অবগত হইয়া তৎপ্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়া পড়েন। চৈতন্যদেব যখন জীবনের শেষাবস্থায় পুরুষোত্তমক্ষেত্রে ভক্ত-মণ্ডলীতে বিহার করিতেছিলেন, সেই সময়ে বঙ্গদেশীয় অন্যান্য ভক্ত বৈষ্ণবগণের পরামর্শে শ্রীনিবাস চৈতন্যচরণ দর্শনের জন্য বহির্গত হয়েন, এবং কিয়দ্দূর গমন করার পর পথিমধ্যে গৌরের মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ করেন। চৈতন্যের অন্তর্দ্ধানের পরে, বঙ্গীয় বৈষ্ণব সমাজে ইনি যথেষ্ট সম্মান ও প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। জীবগোস্বামী প্রভৃতি বৃন্দাবনবাসী প্রধান প্রধান জ্ঞানী ও ভক্ত-

---

* ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে সম্রাট জাহাঙ্গীরের সাহায্যে রাজা মানসিংহ দিল্লী হইতে বঙ্গদেশে আইসেন। তিনি অগ্রদ্বীপে উপনীত হইয়া ঘোষঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত গোপীনাথ বিগ্রহ দর্শন করিয়াছিলেন। "ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিত" ৭৮ পৃষ্ঠা দেখ।

বৈষ্ণবগণ শ্রীনিবাসের বিদ্যাবুদ্ধি ও ভগবন্নিষ্ঠাতে মুগ্ধ হইয়া তৎপ্রতি বঙ্গদেশে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারের ভারার্পণ করিয়াছিলেন। কিছুদিন ভক্তিশাস্ত্র প্রচারের পর শ্রীনিবাস বিবাহ করেন। ইঁহার তিনটী পুত্র হইয়াছিল। তাহাদের নাম বৃন্দাবন, রাধাকৃষ্ণ ও গীতগোবিন্দ। গৌড়লীলা সমাপ্তির বহুদিন পরে অবধূত নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র গোস্বামী জাজিগ্রামে আগমন করিয়া শ্রীনিবাসের এই পুত্রগণকে অল্পবয়স্ক বালক দেখিয়াছিলেন। শ্রীনিবাসের এই গীতগোবিন্দ নামক পুত্রকেই লেখক চৈতন্যের সমকালীন ও তাঁহার প্রিয় শিষ্য বলিতেছেন। টিপ্পনীতে উদ্ধৃত গোবিন্দদাসের একটী কবিতাতে "প্রতাপ আদিত এরসে ভাসিত" এইটুকুমাত্র পাঠ করিয়া তিনি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, "উৎকলাধিপ মহারাজ প্রতাপাদিত্য গৌরাঙ্গের আশ্রয় লইতে অনেক যত্ন করেন। কিন্তু সন্ন্যাসী হইয়া নৃপতির সহিত গৌরাঙ্গ কোন সংস্রব রাখিতে চান না। অনেক সাধ্যসাধনার পর তৎপ্রতি নিত্যানন্দের কৃপা হয়। এবং গৌরাঙ্গের অকৃপাতে যখন প্রতাপাদিত্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে উদ্যত হন, তখন নিত্যানন্দ গোবিন্দাচার্য্যের দ্বারা গৌরাঙ্গের এক বহির্ব্বাস লাভ করিয়া চৈতন্যের কৃপার চিহ্নস্বরূপ উহা প্রতাপাদিত্যের নিকট প্রেরণ করেন। এই বহির্ব্বাস পাইয়া প্রতাপাদিত্য আপাততঃ প্রাণধারণ করিতে কৃতসংকল্প হন। সেই অবধি গোবিন্দের সঙ্গে প্রতাপাদিত্যের অত্যন্ত সখ্য জন্মে। শ্রীনিবাসসুত গোবিন্দ প্রভুর নিতান্ত অন্তরঙ্গ বলিয়া প্রতাপ তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন। এবং স্বীয় কোন কোন পদের ভণিতায় প্রতাপাদিত্যের নামোল্লেখ করিয়া গোবিন্দও তৎপ্রতি প্রচুর দয়াপ্রকাশ করিতেন।" বোধ হয় লেখক অবগত নহেন যে, তদানীন্তন উৎকলাধিপতির নাম

প্রতাপাদিত্য নহে। গজপতি প্রতাপরুদ্র নামক গঙ্গাবংশীয় কোন ধর্ম্মপরায়ণ রাজা ১৫০৪ হইতে ১৫৩২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উৎকলের রাজাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। নিত্যানন্দ গোবিন্দাচার্য্যের নিকট হইতে প্রতাপরুদ্রের জন্য চৈতন্যের বহির্ব্বাস চাহিয়া লয়েন নাই, ঈশ্বরপুরীর প্রেরিত চৈতন্যের সেবাকার্য্যে নিযুক্ত ভৃত্য গোবিন্দই নিত্যানন্দকে বহির্ব্বাস দিয়াছিলেন।* সুতরাং এইসূত্রে প্রতাপরুদ্রের সহিত গোবিন্দাচার্য্যের বন্ধুতার কথা লেখকের কল্পনা মাত্র। লেখক গীতগোবিন্দের স্বীয় পরিচয়াত্মক পদটী প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহার ভণিতায় আছে—

মনের আনন্দে শ্রীনিবাসসুত
গীতগোবিন্দচিত ভোররে॥

এই কবিতাতে শ্রীনিবাসসুত গীতগোবিন্দের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু ইনি গোবিন্দদাস নামে আপনাকে আর কোথাও পরিচিত করেন নাই। এদেশে শ্রীনিবাস আচার্য্যের পরিবার (শিষ্য) বলিয়া যাঁহারা আপনাকে পরিচয় দেন, তাঁহারা আচার্য্য নামেই গুরুবংশের উল্লেখ করিয়া থাকেন। উক্ত কবিতার "শ্রীনিবাসসুত গীতগোবিন্দ ভোররে" এই ভণিতাতে স্পষ্টতঃ উপলব্ধি হয় যে গীতগোবিন্দ নামে একজন স্বতন্ত্র বৈষ্ণব কবি ছিলেন। আমরা কোন কোন প্রাচীন বৈষ্ণবের প্রমুখাৎ শুনিলাম গীতগোবিন্দের রচিত আরও দুই চারিটী পদ আছে। সুতরাং ইঁহাকে গোবিন্দদাস নামে অভিহিত করিবার কোন কারণ নাই।

---

* তবে নিত্যানন্দ গোঁসাই গোবিন্দের পাশ।
মাগিয়া লইল প্রভুর এক বহির্ব্বাস॥
চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য লীলা দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

প্রবন্ধলেখক যে ছয়জন গোবিন্দদাসের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তন্মধ্যে পাঁচজনের সম্বন্ধে আমরা যথাসাধ্য আলোচনা করিয়া অবগত হইলাম যে ইঁহারা কেহই সুবিখ্যাত বৈষ্ণবকবি গোবিন্দদাস নহেন। পদ্মার দক্ষিণতীর সমীপবর্ত্তী বুধরী-নিবাসী * বৈদ্যবংশোদ্ভব বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র কবিরাজের জ্যেষ্ঠ সহোদর গোবিন্দ কবিরাজই প্রকৃত গোবিন্দদাস। রাজসাহী জেলার অন্তর্গত পদ্মাতটের অনতিদূরবর্ত্তী খেতরি বা খেতুরগ্রামনিবাসী নরোত্তম ঠাকুর ও জাজিগ্রামের শ্রীনিবাস আচার্য্য যে সময়ে এদেশে হরিভক্তি ও নামসংকীর্ত্তন প্রচার করেন, সেই সময়ে ইহাঁরা বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভক্তমাল প্রভৃতি গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া যথাসম্ভব ইঁহাদের বিবরণ লিখিত হইতেছে। রামচন্দ্র ও গোবিন্দ কবিরাজ প্রথমে ঘোর শাক্ত ছিলেন। রামচন্দ্রের ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তনের বৃত্তান্ত ভক্তমালে এইরূপ লিখিত আছে। একদিন শ্রীনিবাস আচার্য্য স্বীয় বাসভবনের সম্মুখস্থ বৃক্ষতলে ভক্তগণ সহ হরিকথাপ্রসঙ্গে সুখাসীন আছেন; এমন সময়ে রামচন্দ্র কবিরাজ বিবাহ করিয়া শিবিকারোহণে সেইস্থানে আসিয়া বিশ্রামলাভের জন্য উপস্থিত হইলেন। যুবা রামচন্দ্রের গৌরবর্ণ উজ্জ্বল মুখশ্রী দর্শনে প্রীত হইয়া শ্রীনিবাস ভক্তগণকে বলিতে লাগিলেন,

এই যে পুরুষ হেন সৌন্দর্য্যে শোভয়।
কৃষ্ণদাস হয় যদি তবে সুশোভয়॥

---

* "ভক্তিরত্নাকর" গ্রন্থে লিখিত আছে গোবিন্দ কবিরাজ তেলিয়া বুধরীতে আসিয়া বাস করেন, সুতরাং উক্ত গ্রাম তাঁহার জন্মস্থান বলিয়া বোধ হয় না। উক্ত গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে বুধরী পদ্মা ও গঙ্গার মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে অবস্থিত, অতএব তাহা মুরশিদাবাদ জেলার অন্তর্গত হওয়াই সম্ভব।

তৎপরে রামচন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া আচার্য্য বৈরাগ্য-উদ্দীপক অনেক উপদেশ দেন। তাঁহার প্রাণস্পর্শী উপদেশে রামচন্দ্রের হৃদয়ে অকস্মাৎ বৈরাগ্যের সঞ্চার হয়, বিবাহের দুই তিন দিন পরেই রামচন্দ্র, আচার্য্যের শরণাপন্ন হইয়া দীক্ষা গ্রহণ করেন। পরে ইনি পাণ্ডিত্য ও ভক্তিরসে বিশেষ বিখ্যাত হইয়াছিলেন। নরোত্তম ঠাকুরের সহিত ইঁহার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গোবিন্দ কবিরাজকে বৈষ্ণবধর্ম্ম আশ্রয় করিবার জন্য ইনি পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু শক্তিসেবক বামাচারী গোবিন্দ তাহা উপেক্ষা করিয়া রামচন্দ্রকে ভর্ৎসনা করিতেন। কথিত আছে, একদিন একজন বৈষ্ণব ইঁহাদের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন। অতিথির ধর্ম্মমত না জানিয়া গোবিন্দ দেবীমন্দিরে তাহার আহ্নিক পূজার ব্যবস্থা করিয়া দেন। অতিথি মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, তথায় মুক্তকেশী কালীমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে এবং নৈবেদ্য পুষ্পাদি পূজার বিবিধ উপকরণ সজ্জিত রহিয়াছে। সেখানে শালগ্রামশিলাও রহিয়াছে দেখিয়া অতিথি সমুদায় পুষ্পাদি দ্বারা শালগ্রামের অর্চ্চনা করিল। পরে নিয়মিত পূজক ব্রাহ্মণ আসিয়া সেই উৎসৃষ্ট নৈবেদ্যাদি পুনর্ব্বার কালীকে নিবেদন করিয়া চলিয়া গেল। সেইদিন রাত্রিতে দেবী স্বপ্নে আবির্ভূত হইয়া গোবিন্দকে বলিলেন, “আমি আজি বিষ্ণুর মহাপ্রসাদ পাইয়া পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। পরাৎপর হরি আমার প্রভু, তুমি পাণ্ডিত্যাভিমান পরিত্যাগ করিয়া শ্রীহরির ভজনা কর।” দেবীর বাক্যে গোবিন্দ উদ্বিগ্ন হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে গোবিন্দ গ্রহণী রোগে মরণাপন্ন হন। অন্তিম শয্যায় শয়ন করিয়া ইষ্টদেবীকে স্মরণ করিবামাত্র ভগবতী আকাশবাণীতে গোবিন্দকে পুনর্ব্বার

শ্রীকৃষ্ণচরণাশ্রয় করিতে বলেন। দেবীর বাক্যে গোবিন্দের চৈতন্য হয়। তখন অনুতাপ করিয়া কান্দিতে লাগিলেন এবং তৎক্ষণাৎ কনিষ্ঠভ্রাতা রামচন্দ্রকে দৈন্যোক্তি করিয়া পত্র লিখিলেন। পত্র পাইবামাত্র রামচন্দ্র শ্রীনিবাস আচার্য্যকে সঙ্গে লইয়া বুধরীতে আসিলেন। গোবিন্দ মৃত্যুশয্যায় শায়িত, অতিকষ্টে হাতযোড় করিয়া আচার্য্যকে অস্ফুট গদগদস্বরে স্তব করিতে লাগিলেন। বক্ষস্থল ভাসাইয়া অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। এই অবস্থায় শ্রীনিবাস গোবিন্দকে 'হরিনাম মহামন্ত্রে' দীক্ষিত করিলেন। কথিত আছে তৎক্ষণাৎ গোবিন্দের শান্তি হইল, এবং তিনি অসাধারণ কবিত্বশক্তি লাভ করিয়া এই পদটী রচনাপূর্ব্বক ভক্তগণকে শুনাইলেন।

ভজহ রে মন নন্দনন্দন অভয় চরণারবিন্দ।
দুর্লভ মানুষ জনমে সতসঙ্গে তরহ এ ভবসিন্দু॥
শীত আতপ বাত বরিখনে এ দিন যামিনী জাগি।
বিফলে সেবিনু কৃপণ দুরজন চপল সুখ লাভ লাগি॥
এ রূপ যৌবন ভবন ধনজন কি আছে ইথে পরতীত।
কমলদলজল জীবন টলমল সেবহ হরিপদ নিত॥
শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ বন্দন পাদসেবন দাস।
পূজত সখীগণ আত্মসমর্পণ গোবিন্দদাস অভিলাষ॥ *

ভক্তমালের বর্ণনানুসারে এই পদটীই গোবিন্দদাসের সর্ব্বপ্রথম রচনা। দীক্ষার পর হইতে ইনি "গোবিন্দদাস ঠাকুর" নামে বিখ্যাত হন। এবং রাধাকৃষ্ণের মাধুর্য্যরসমিশ্রিত প্রেমলীলা ও অপরূপ গৌরাঙ্গলীলা সম্বন্ধে বিস্তর পদ রচনা করেন।

গোবিন্দদাস ক্রমশঃ "সঙ্গীতমাধব" নামে নাটক ও "গীতা-

---

* এই পদটীর নানারূপ পাঠান্তর আছে। আমরা তিন চারিখানি পুস্তক মিলাইয়া লিখিলাম।

মৃত” গ্রন্থ রচনা করেন। নিত্যানন্দের পত্নী জাহ্নবীদেবীর সঙ্গে গোবিন্দ বৃন্দাবন গমন করিলে, তত্রত্য ভক্তগণ তাঁহার কাব্য শ্রবণ করিয়া প্রীতিলাভ করেন। জীবগোস্বামীপ্রমুখ বৃন্দাবন-বাসী প্রধান প্রধান বৈষ্ণবগণ তাঁহার আশ্চর্য্য কবিত্বশক্তির পরিচয় পাইয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাঁহাকে ‘কবিরাজ’ উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব সাহিত্যে গোবিন্দদাসের আসন অতি উচ্চ। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে ইনি বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের সমকক্ষ কবি বলিয়া বিশেষ সম্মানিত ও সম্পূজিত হইয়া আসিতেছেন। গোবিন্দদাসরচিত “সঙ্গীতমাধব” ও “গীতামৃত” গ্রন্থ এখন অতীব দুষ্প্রাপ্য। “পদামৃতসমুদ্র,” “পদকল্পতরু,” “পদকল্প-লতিকা” প্রভৃতি বৈষ্ণবদিগের সংগ্রহ-পুস্তকে গোবিন্দদাসের পদাবলী দেখিতে পাওয়া যায়। ইঁহার রচিত একান্নটী পদ-সংযুক্ত “একান্নপদ” গ্রন্থ বৈষ্ণবসমাজে সুপরিচিত ও সমাদৃত।

গোবিন্দদাসের জীবনী সম্বন্ধে ইহার অধিক কিছু আমরা জানিতে পারি নাই। লেখক মহাশয়ও বেশী কিছু বলেন নাই। লেখক একস্থানে বলিতেছেন, “ইনি চৈতন্যের জন্মের ৮২ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৪৮৯ শকাব্দায় বা ১৫৬৭ খ্রীঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন।” আমাদের বিবেচনায় চৈতন্যের অন্তর্দ্ধানের অল্পদিন পরেই গোবিন্দদাসের জন্ম হইয়াছিল। “চৈতন্যচরিতামৃত” গ্রন্থে কবিরাজ গোস্বামী গোবিন্দদাসের উল্লেখ করিয়াছেন, এবং “নরোত্তমবিলাসে” লিখিত আছে, বৃন্দাবনে ইঁহাদের পরস্পরের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। ১৫৩৭ শকে কৃষ্ণদাস কবিরাজের “চৈতন্যচরিতামৃত” গ্রন্থরচনা সম্পূর্ণ হয়। * এই সময়ে কৃষ্ণদাস

* শাকে সিন্ধ্বগ্নি বাণেন্দৌ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে।
সূর্য্যাহেঽসিত পঞ্চম্যাং গ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতাং গতঃ॥

অতিশয় বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াছিলেন। গোবিন্দদাসকে কৃষ্ণদাস কবিরাজের সমকালীন লোক বলিয়া স্থির করিলে, শকাব্দার পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে, অর্থাৎ ১৪৮০ শকাব্দায়, কি তাহার দুই চারি বৎসর পরে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। সনাতন গোস্বামী "বৈষ্ণবতোষণী" গ্রন্থ ১৪৭৬ শকাব্দায় রচনা করেন। * ইহার পরেও তিনি কিছুদিন সম্ভবতঃ ১৪৯০ শক পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। রামচন্দ্র কবিরাজ ও গোবিন্দদাস কবিরাজের প্রিয়সুহৃৎ নরোত্তম ঠাকুর যখন যৌবনের প্রথম অবস্থায় বৃন্দাবনে ভক্তমণ্ডলীতে আসিয়া মিলিত হন, তৎপূর্ব্বেই রূপ ও সনাতন গোস্বামী মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন। ইহার কিয়দ্দিন পরে ১৫০০ শকাব্দায়—কি ২।৪ বৎসর অগ্রপশ্চাৎ সময়ে গোবিন্দদাস বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া পদাবলী রচনাতে নিযুক্ত হন বলা যাইতে পারে। কেবল গোবিন্দদাস কেন, জ্ঞানদাস, শিবরামদাস, যদুনন্দন চক্রবর্ত্তী, কবিচন্দ্র প্রভৃতি অনেকে এই সময়ে শ্রীকৃষ্ণলীলা ও গৌরাঙ্গলীলা বিষয়ক সঙ্গীত রচনা করিয়া বাঙ্গলা সাহিত্যকে পরিপুষ্ট ও শ্রীসম্পন্ন করিয়াছিলেন।

শুন শুন নিরদয়হৃদয় মাধব সে যে সুন্দরী রাই—ইত্যাদি।

যে পদটী টিপ্পনীতে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার অন্তে

প্রতাপ আদিত এরসে ভাসিত
দাস গোবিন্দ গান।

এই ভণিতা দেখিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন, গোবিন্দদাস নামে কোন কবি যশোহরাধিপতি প্রতাপাদিত্যের সভাসদ ছিলেন। কোন কোন কবিতার শেষে "রায় বসন্ত মধুপ আন-

---

* "সজ্জনতোষণী" ২য় খণ্ড দ্বাদশ সংখ্যা।

ন্দিত নিন্দিত দাস গোবিন্দ” ইত্যাদি ভণিতা পাঠ করিলে এই অনুমান যে নিতান্ত অমূলক তাহা বোধ হয় না। রায় বসন্ত বা বসন্তরায় প্রতাপাদিত্যের পিতৃব্য ছিলেন,ইতিহাসাভিজ্ঞ ব্যক্তি-মাত্রেই তাহা অবগত আছেন। এই বসন্তরায় একজন কবি ছিলেন, এরূপ প্রবাদও শ্রুত হওয়া যায়। “নরোত্তমবিলাস” পাঠে জানা যায় মহাকবি বসন্ত রায় নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন। * ইঁহাকে প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত বসন্ত রায় বলিয়া অসংশয়িতরূপে প্রতিপাদিত করা যাইতে পারে, এরূপ নিশ্চিত প্রমাণ আমরা এপর্য্যন্ত প্রাপ্ত হই নাই। গোবিন্দদাসের কবি-তাতে প্রতাপাদিত্য ও বসন্তরায়ের নাম এবং বৈষ্ণব সমাজের ইতিহাসস্বরূপ নরহরিদাসপ্রণীত নরোত্তমবিলাসে মহাকবি বসন্তরায়ের উল্লেখ দেখিয়া মনে হয় যে, বসন্তরায় ও বুধরী-নিবাসী গোবিন্দদাস এক সময়ের লোক ও উভয়ে পরস্পরের বন্ধু ছিলেন।

“ক্ষিতীশ বংশাবলিচরিত” গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে “প্রতা-পাদিত্য, স্বীয় পিতৃব্য বসন্ত রায়ের প্রাণসংহার করিয়া, তদীয় পুত্রকেও হত্যা করিতে চেষ্টিত হইয়াছিলেন; কিন্তু রাজ্ঞী নানা কৌশলে ঐ যুবকের জীবন রক্ষা করেন। একবার কচুবনে লুক্কায়িত হইয়া আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা পাওয়াতে, তিনি কচু রায় নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। অবশেষে কচু রায় পলায়ন করিয়া সম্রাটের শরণাগত হইলেন। তৎকালে সম্রাট জাঁহাগির দিল্লির রাজসিংহাসনে আসীন হইয়াছিলেন। তিনি প্রতাপা-

---

* জয় জয় মহাকবি শ্রীবসন্তরায়।
সদামগ্ন রাধাকৃষ্ণ চৈতন্যলীলায়॥
নরোত্তমবিলাস, দ্বাদশ বিলাস।

দিত্যের নৃশংস ব্যবহারে অতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়া তাঁহার দমনার্থে রাজা মানসিংহকে পাঠাইলেন।" * এই সময়ে কৃষ্ণনগর রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ ভবানন্দ মজুন্দার নানা প্রকারে রাজা মানসিংহের সহায়তা করায় মানসিংহ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ১৪টী পরগণার জমিদারী প্রদান করেন। পরে সম্রাট জাহাঙ্গীর উক্ত জমিদারীর ফরমাণ বা রাজসনন্দ ভবানন্দকে অর্পণ করিয়াছিলেন। এই ফরমাণের তারিখ হিজরী ১০১৫ খ্রীষ্টাব্দ ১৬০৬ † ১৫২৮ শকাব্দ। ইহার পূর্ব্বে বৃদ্ধাবস্থায় বসন্তরায় নিহত হইয়াছিলেন। বসন্তরায় ও গোবিন্দদাসকে সমসাময়িক বলিয়া ধরিলে ১৫০০ শকাব্দার কাছাকাছি সময়ে গোবিন্দদাস পদরচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন অনুমান করা অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না।

বিদ্যাপতির ন্যায় গোবিন্দদাসের পদাবলীতে হিন্দীশব্দের অধিক প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। ভাষার মাধুর্য্য, শব্দযোজনার পারিপাট্য এবং বর্ণনার সৌন্দর্য্যে তাহা অতিশয় প্রীতিপ্রদ; অনেকস্থলে ভাবের গভীরতাও যথেষ্ট আছে।

লেখক মহাশয় অপর তিনজন গোবিন্দের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদিগকে গীতরচয়িতা বলেন নাই; সুতরাং আমরা তাঁহাদের আলোচনা পরিত্যাগ করিলাম। বৈষ্ণবগ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে আমরা আর দুইজন গোবিন্দের নাম পাইয়াছি। একজনের নাম গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী, ইনি নরোত্তম ঠাকুরের ভবনে ভক্তসহবাসে থাকিয়া নাম সংকীর্ত্তন সাধনভজন করিতেন, এইমাত্র জানা যায়। দ্বিতীয় ব্যক্তির নাম গোবিন্দ-

---

* ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর প্রণীত অন্নদামঙ্গল দেখ।

† ক্ষিতীশ বংশাবলিচরিত ৮০ পৃষ্ঠা।

দাস। ইঁহার নিবাস উত্তর রাঢ়। রথযাত্রার সময়ে বঙ্গদেশীয় বৈষ্ণবগণ প্রতিবৎসর চৈতন্যকে দর্শন করিবার জন্য নীলাচলে গমন করিতেন। এ ব্যক্তি সেই সঙ্গে যাইবার ইচ্ছা করিয়া শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকারের সন্নিধানে উপনীত হইয়াছিলেন। ইহাঁর সম্বন্ধেও আর কিছু জ্ঞাত হওয়া যায় না। *

আমাদের প্রস্তাব দীর্ঘ হইয়া পড়িল। আমরা এই প্রবন্ধে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছি যে,—(১) চৈতন্যের পূর্ব্ববর্ত্তী এবং বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের সময়ে গোবিন্দদাস নামে কোন বঙ্গীয় কবি ছিলেন না। (২) শ্রীনিবাস আচার্য্যের পুত্র গীত-গোবিন্দ ও গৌরাঙ্গের প্রধান কীর্ত্তনগায়ক গোবিন্দঘোষ পদরচয়িতা হইলেও তাঁহারা স্বীয় স্বীয় নামেই আপনাদের পরিচয় দিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদিগকে গোবিন্দদাস নামে অভিহিত করা যায় না। (৩) চৈতন্যের অন্যতম সঙ্গীতশিষ্য গোবিন্দানন্দ ভাগবত ও গোবিন্দ দত্তকে পদকর্ত্তা গোবিন্দদাস বলা যাইতে পারে এমন কোন প্রমাণ নাই। তবে গিরীশ্বরনন্দন গোবিন্দদাস ভণিতাযুক্ত একটী পদ দেখিয়া অনুমান হয়, ইনি একজন গানরচয়িতা স্বতন্ত্র ব্যক্তি। (৪) বুধরীনিবাসী শ্রীনিবাস-শিষ্য গোবিন্দ কবিরাজই দেশবিখ্যাত বৈষ্ণব কবি গোবিন্দদাস। (৫) রায়বসন্ত গোবিন্দদাসের সমকালীন ও বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী একজন প্রধান কবি ছিলেন, ইহা অনুমান করা নিতান্ত অসঙ্গত নয়।

আমরা অনেক পরিশ্রম করিয়া এ সম্বন্ধে যৎসামান্য যাহা জ্ঞাত হইতে পরিয়াছি, সহৃদয় পাঠকদিগের নিকটে তাহা উপস্থিত করিলাম। প্রকৃত ঐতিহাসিক সত্য এদেশে চিরকাল কল্পনার

* প্রেমানন্দ দাস কর্ত্তৃক অনুবাদিত চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের দশম অঙ্ক।

অন্ধকার গহ্বরে প্রচ্ছন্ন। বৈষ্ণব সাহিত্যেও এই চিরাচরিত প্রথার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। যদি কেহ আমাদের ভ্রম প্রদর্শন করিয়া এ সম্বন্ধে প্রকৃত তত্ত্ব প্রকাশ করেন, তাহা হইলে আমরা পরম আপ্যায়িত হইব।

ডাক্তার বাবু।

রামদাস জাতিতে ব্রাহ্মণ, উপাধিতে ভট্টাচার্য্য, বয়সে নবীন, ব্যবসায়ে ডাক্তার। নিজ বল্লভপুরে এবং তাহার আশেপাশে, রামদাসের ভারি পশার, ও অঞ্চলে নাকি তার জোড়াটী মিলে না। কিন্তু কেবল ডাক্তারীই তার গুজরান নয়, সে বহুরূপী। যখন হুঁকাহাতে, খালি গায়ে, শুধু পায়ে, "মাঠ তদারকে" বাহির হয় তখন সে দাদাঠাকুর, যখন কপালে চন্দন, কাঁধে নামাবলি, হাতে নৈবেদ্য, তখন "পুরুত ঠাকুর, আবার যখন পোষাক আঁটা, ঘোড়ায় চড়া তখন ডাক্তার বাবু! তার আরও রূপ আছে, যখন ঢুলু ঢুলু নয়নে, স্খলিত বসনে, চঞ্চল চরণে কেলুসার দোকান হইতে বাহির হয়, তখন সে অপরূপ!

কিন্তু এহেন রামদাস চরিতামৃতের আস্বাদ সম্পূর্ণরূপে লইতে গেলে একটু পূর্ব্বাভাষের প্রয়োজন। রামদাসের পিতা ত্রিলোচন ভট্টাচার্য্য পুরোহিতের ব্যবসা করিতেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিদাস নয় বৎসর বয়সেই পিতার সহকারীরূপে ব্রতী হন। দ্বিতীয় এবং কনিষ্ঠ পুত্র স্বয়ং রামদাস। বল্লভপুরের 'গুরুমশায়' যখন জানাইলেন, রামদাসকে আর তিনি পাঠশালায় রাখিতে পারেন

না, ত্রিলোচন তখন পুত্রের পরিণাম চিন্তায় ব্যাকুল হইলেন! এইরূপে চিন্তার সাগরে হাবুডুবু খাইতে খাইতে অকস্মাৎ সম্মুখে কূল দেখিতে পাইলেন। তাঁর এক যজমানের বন্ধুর জামাতা, সুকুমার মৈত্র কলিকাতায় ডাক্তারী করেন। সুকুমার বাবু শ্বশুরালয়ে আসিয়াছিলেন, শ্বশুরের অনুরোধে, ত্রিলোচনের আশীর্ব্বাদে বদ্ধ হইয়া, রামদাসকে সঙ্গে লইতে স্বীকৃত হইলেন; সুকুমার বাবুর ক্ষুদ্র পরিবার—বন্দোবস্ত হইল, রামদাস তাঁর বাসায় রাঁধিবে, আর সুবিধা ও সাবকাশমত পড়াশুনা করিবে। রামদাস এ প্রস্তাবে মহাখুসী, পাড়াগাঁয়ের যে মজা সে ত তা লুটিয়াছে, এখন সহরের আস্বাদটা আর বাকি থাকে কেন? মহা উৎসাহে রামদাস নিজের ক্ষুদ্র পুঁটুলীটী কোমরে বাঁধিয়া সবে এই সতের বৎসর মাত্র বয়সে ডাক্তার বাবুর সঙ্গে কলিকাতা যাত্রা করিল। নিজের কলি হুঁকাটী লইতে ভুলিল না, কিন্তু মনের আনন্দে,বাপ ভাইকে বিদায়ের প্রণাম করিতে ভুলিয়া গেল।

সুকুমার বাবু রামদাসের গুণগ্রামের পরিচয় কিছু পূর্ব্বে পান নাই, একে একে তিনি দেখিলেন, রামদাস বিনা লবণে দাল রাঁধিতে পারে, ঝাল ব্যতীত মাছের ঝোল রাঁধে, তেল না হইলেও ভাজাভুজিতে তার আপত্তি নাই। প্রায়ই যেখানকার ঝালমসলা লবণ সেখানেই পড়িয়া থাকে, রামদাস এদিকে অবাধে ব্যঞ্জনাদি রাঁধিয়া যায়। এইরূপে ডাক্তার বাবুর দিনে দিনে আশঙ্কা জন্মিতে লাগিল, বুঝি বা শাপভ্রষ্ট নলরাজা, প্রচ্ছন্ন বেশে পাচকরূপে, তাঁহাকে ছলিতে আসিয়াছেন!

সুকুমার বাবু তাঁর পুত্র বিমলচন্দ্রকে বলিয়া দিলেন যেন তিনি রামদাসকে কিছু কিছু পড়ান। বিমল তাহাকে বোধোদয়ের প্রথম পৃষ্ঠা পড়াইতে পড়াইতে দেখিলেন, তাঁহার ছাত্রের বিশেষ-

রূপে বোধোদয় হইয়াছে! উদ্ভিদের দৃষ্টান্ত জিজ্ঞাসা করায় সে বলিয়াছিল, "কেন কেঁচো"। উত্তর শুনিয়া বিমল হাস্য সম্বরণ করিতে না পারায় রামদাস তর্ক ধরিল, বুঝাইল, যাহা মাটী ভেদ করিয়া উঠে, তাহাই যদি উদ্ভিদ, তবে কেঁচো কেননা উদ্ভিদ হইবে?

আজ যাহা পড়িল, কাল তাহা জিজ্ঞাসা করিলে বলিত "বিলক্ষণ, ও যে পুরোনো পড়া"। এইরূপে দুই বৎসরের মধ্যে রামদাস বোধোদয়, চরিতাবলী প্রভৃতি পড়িয়া ফেলিল, এদিকে বিমল ক্রমে তাহার ছাত্রের বিদ্যা প্রবল হইতে প্রবলতর হইতেছে দেখিয়া আর অগ্রসর হইতে সাহস করিলেন না। নিজের বিলসরকারী কাজটী দিলেন। নূতন পাচক নিযুক্ত হইল। রামদাসের উন্নতি হইল। বেতন তিন টাকা হইতে পাঁচ টাকায়, বয়স সতের হইতে উনিশে, নেশা তামাক ছাড়াইয়া—ছাড়িয়া নয়—মদে উঠিল। তাহার সেই পল্লীগ্রামের চক্ষু, পক্ষীকুলায়ে ডিম্বের মত, এতদিন কলিকাতার বাসায় আবদ্ধ ছিল, অকস্মাৎ বাহিরের তাপ পাইয়া ফুটিয়া উঠিল। সে এখন চটি ছাড়িয়া বুট ধরিয়াছে, চাদর রাখিয়া সার্ট পরিয়াছে, বেড়ি ফেলিয়া ছড়ি ধরিয়াছে! এইরূপে বিলসরকারী করিতে করিতে অকস্মাৎ তার সেই উর্ব্বর মাথায়, আলবার্টের সঙ্গে সঙ্গে কি একটা ফন্দি জাগিয়া উঠিল। সে তখন নানা উপায়ে কম্পাউণ্ডারের সহিত সৌহার্দ্দ স্থাপনের চেষ্টা পাইল, চেষ্টা বিফল হইল না। সে একে একে কয়টা ঔষধের নাম জানিয়া লইল, ফিবার মিক্‌শ্চার, কুইনাইন মিকশ্চার, তাও করিতে শিখিল। মাস কয়েকের মধ্যে সে বুঝিল, ডাক্তারী শাস্ত্র সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে আর তাহার বড় বাকি নাই!

ইহার মধ্যে একদিন শুনা গেল, ডাক্তার বাবুর একশেট অস্ত্র, একটা ষ্টিথস্কোপ, আর একটা থরমোমেটর পাওয়া যাইতেছে না!

...   .

পিতার সংশয়াপন্ন অবস্থা জানিয়া—হঠাৎ রামদাসকে বাটী যাইতে হইল। সে গিয়াই পিতার নাড়ি টিপিল তার পর মুখ গম্ভীর করিয়া, দাদাকে ভৎর্সনা করিয়া বলিল, কেন তাহাকে পূর্ব্বে সংবাদ দেওয়া হইল না; সে নিজে ডাক্তার থাকিতে, তাহার পিতাকে বিনা চিকিৎসায় মারা যাইতে হইল, ইহা অপেক্ষা দুঃখের ও কষ্টের কারণ আর কি হইতে পারে? রামদাস তবু হাল ছাড়িল না, সে কাগজ কলম লইয়া, তাড়াতাড়ি বাঙ্গলায় প্রিস্কিপ্সন লিখিতে বসিল, দশ ক্রোশ দূর হইতে ঔষধ আনাইতে হইবে। ত্রিলোচন, এই অন্তিম কালে ডাক্তারী ঔষধ সেবনে নিতান্ত অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে রামদাস "প্রেজুডিস" বলিয়া, নাক সিট্কাইয়া, অধিকতর গম্ভীরভাবে পায়ের উপর পা দিয়া বসিল। ত্রিলোচন অনিমিষলোচনে পুত্রের সেই পাণ্ডিত্যগর্ব্বিত বদনকমল নিরীক্ষণ করিতে করিতে ভাবিতে লাগিলেন—ছেলে আমার ডাক্তার হয়েছে তবে আর "করে' খাবার" ভাবনা নাই! তখন বৃদ্ধের আনন্দাশ্রু বহিল, পার্শ্বে ও নিকটে যজমান যে দুচারি জন ছিল, তারা ভাবিল, "ছোটদাদা ঠাকুর আমাদের ডাক্তারীতে ভারি লায়েক হয়েছে।"

অর্দ্ধ ঘণ্টা যাইতে না যাইতে ত্রিলোচনের শ্বাস বহিতে আরম্ভ হইল, ঔষধ আনিবার নিমিত্ত লোক গ্রামের বাহির হইতে না হইতে বৃদ্ধের প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গেল!

তার পর শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করিয়া রামদাস আবার কলি-

কাতায় ফিরিল। যাইবার সময় গ্রামের লোককে আশা দিয়া গেল, আর "বিনা চিকিৎসায়" কাহাকেও মারা যাইতে হইবে না!

বাড়ী হইতে আসিয়া রামদাস মাস খানেক বিলসরকারী করিল। একদিন রাত্রে বিল আদায় করিয়া আনিয়া, সে ডাক্তার বাবুর পা ধরিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল। ব্যাপারখানা জানিতে চাহিলে বলিল, "বিল আদায় করে আন্‌চি, আর মেছোবাজার ষ্ট্রীটে তিন বেটা কাফ্রি আমার কাছ হ'তে ৩৭৷৶০ সাইত্রিশ টাকা দশ আনা ছিনিয়ে নিয়েছে।" টানাটানিতে সার্ট ছিঁড়িয়াছে, তাও দেখাইল, তাদের হাতে তার নানারূপ দুর্দ্দশা হওয়ার কথাও জলন্ত ভাষায় বর্ণন করিল, শেষে বলিল, কেবল ডাক্তার বাবুর পুণ্যেই সে এ যাত্রা রক্ষা পেয়েছে, ভাগ্যে যেই তার চীৎকারে লোক জড় হয়েছিলো তাই প্রাণে প্রাণে বেঁচেছে। বুকপকেটে যে একখানা বিল ও পাঁচটাকার নোট ছিল, তা কিন্তু নিতে পারেনি। ডাক্তার বাবু এ ঘটনা বিশ্বাস করিয়াছিলেন কি না ঠিক জানি না, কিন্তু সে জন্য কিছু বলিলেন না— রামদাস নিজেই বলিল, সে আর এ কাজ করিবে না—প্রাণে বেঁচে থাক্‌লে তবে ত উপার্জ্জন। রামদাস তার পরদিন হইতে বিলসরকারী ছাড়িয়া দিল, এবং অন্য কাজকর্ম্মের চেষ্টার জন্য ডাক্তার বাবুকে বিশেষরূপে ধরিল।

দিন কত পরে রামদাসের বাটী হ'তে এক পত্র এসে উপস্থিত! দেশে অনেকগুলি যজমান, তা ছাড়া সংসারের কাজকর্ম্মও আছে, দাদা আর একা পেরে উঠ্‌ছেন না। যথাসময়ে এ পত্র ডাক্তার বাবুকে দেখান হইল, তিনি রামদাসের প্রাপ্য বেতন চুকাইয়া দিয়া তাহাকে বিদায় দিলেন। রামদাস কিন্তু আরও দুই দিন কলিকাতায়, স্থানান্তরে রহিল, সে বড়বাজার

হইতে ফাইল চার কুইনাইন আর টাকা কয়েকের অন্য অন্য ঔষধও কিনিল। তারপর সেকেণ্ডহ্যাণ্ডের দুইখানা চেয়ার, একটা আলমারি, ও একটা টেবিলও লইল। কোট পেণ্ট্‌-লেন, একটা পুরান ঘড়ি, কেমিকেল গোল্‌ডের একছড়া চেনও কিনিতে ভুলিল না। ডাক্তারীর অন্য অন্য যে উপ-করণ সে তা পূর্ব্ব হইতেই সংগ্রহ করিতেছিল। একখানা বাঙ্গলা ও আর একখানা ইংরাজি সাইনবোর্ড করাইল, ইংরাজিতে R. D. Bhatta M. P. * এবং বাঙ্গলাতে ডাক্তার রামদাস ভট্টা-চার্য্য এম, পি লেখাইয়া লইল। ছোট বড় অনেকগুলি শিশি এবং বোতল, ছোট ছোট কয়টা সেল্‌ফ, কিছু লাল নীল রংও সংগ্রহ করিয়াছে। বাটীতে বাহিরের ঘর পরিষ্কার করিয়া, দেয়াল কাটিয়া, দুইটা আল্‌মারি করিবার বন্দোবস্ত পূর্ব্বেই করিয়া আসিয়াছিল। রামদাস গ্রামে পা দিতে না দিতে তাহার পোষাকের ছটা, আর আস্‌বাবের ঘটা দেখিয়া দেশে একটা বিষম হৈচৈ উঠিল। তার পর, আবার সে যখন, খালি শিশি ও খালি বোতল রঙ্গিন জল পুরিয়া আল্‌মারি ও সেলফ সাজাইল, সাইনবোর্ট্‌ টাঙ্গাইল তখন একটা হুলস্থুল বাধিয়া গেল। কেহ মোড়লদের রকে বসিয়া তামাকু খাইতে খাইতে, কেহ স্নান করিতে করিতে, কেহ হাটে যাইতে যাইতে বলিল, এমন-ধারা দিগ্‌গজ ডাক্তার এ অঞ্চলে আমরা কখনও দেখিনি!

দেশে আসিয়াই রামদাস মায় রেকাব জিন তের টাকায় এক ঘোড়া কিনিল! এখন রামদাসের চিকিৎসার পালা! রাম-দাসকে ডাকিতে হয় না, কাহারো ব্যারাম হওয়ার খবর পাইলেই

---

* Medical Practitioner.

সে ধড়া আঁটিয়া চেন ঝুলাইয়া রোগীর শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হয়। রামদাস যখন রোগীর নাড়ি টিপিয়া, দশনে অধর পীড়িত করিয়া, ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে রোগীর বিবরণ শুনে, তখন কাহার সাধ্য ঠিক করে, ইনি এম-বি, কি এম-ডি! রামদাস বোতল বোতল ঔষধ দেয়, সময়ে সাবু মিছরিও যোগায়, কিন্তু দামের বেলায়, রামদাসের কড়াকড়ি নাই। কেহ আট দশ গণ্ডা পয়সা, কেহ পাঁচ সাত পালি চাল, কেহ ধান, কেহ গুড়, যে যা দেয়, রামদাস হাসিহাসি মুখে তাহাই লয়! রোগী যখন যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছে, রামদাস তখন তাহার সাক্ষাতে সোডা এসিড তৈয়ার করিতে বসে! ফোঁস ফোঁস শব্দ মাত্র রোগীকে উল্লেখ করিয়া বলে, ভাইরে যেমন জোর দেখ্‌চো, ভিতরে গিয়েও ঔষধের এমনি জোর ধরিবে। শুনিয়া রোগী অবাক হইয়া যায়, দেখিয়া দর্শকবৃন্দ স্তম্ভিত হয়! কাহারো হাত কি পা ভাঙ্গিয়া গেলে রামদাস তৎক্ষণাৎ হাওড্রাকসেন হয়েছে, ক্লাকসান করিলেই ভাল হইবে বলিয়া জলপটি বাঁধিয়া দেয়! অস্ত্রবিদ্যাতেও রামদাস বিশেষ হাত দেখাইতে লাগিল! এই-রূপে অচিরাৎ রামদাসের পসারে দেশ ছাইয়া উঠিল; গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে একটা ধিধি, একটা ঢিঢি পড়িয়া গেল!

রামদাস আর না ডাকিলে যায় না, টাকা বৈ সিকি আধুলি লয় না! চাল ধান খড়ে আর তার তেমন রুচি নাই!

সুকুমার বাবুর শ্বশুরবাটী যে গ্রামে, একদিন সেখান হইতে রামদাসের একটা ডাক আসিল। রামদাসের আর একটা ডাক ছিল, সেইটা সারিয়া আসিতে তার কিছু বিলম্ব হইল। তার পর রামদাস সেই রোগীর বাড়ী গিয়া দেখে, রোগীর শয্যাপার্শ্বে, সর্ব্বনাশ, স্বয়ং সুকুমার বাবু!

হঠাৎ পকেটস্থ ষ্টিথস্কোপ ও থারমোমেটারের দিকে রামদাসের নজর পড়িল, বুঝি, প্রাণটা তার কেমন করিয়া উঠিল!

সম্মুখে তীব্র আলোক দেখিলে উর্দ্ধফণা অহিবিষ যেমন থমকিয়া দাঁড়ায়, অথবা অজাগর সম্মুখে পক্ষীকুল যেমন নিস্পন্দ হইয়া যায়, প্রথম সাক্ষাতে সুকুমার বাবুর সম্মুখে রামদাসেরও সেই দশা ঘটিল। কিন্তু ভট্টাচার্য্যপুত্র রামদাস একেবারে বোকা বণিবার পাত্র নহে, সে মুহূর্ত্তে আত্মসম্বরণ করিয়া, ষ্টিথস্কোপটাকে পকেটের এক প্রান্তে রাখিল। তারপর তাড়াতাড়ি, হাসিহাসি মুখে সুকুমার বাবুকে সাহেবি ধরণে নমস্কার করিল, কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিতেও কসুর করিল না। সুকুমার বাবু অভ্যাসবশতঃ প্রতিনমস্কার করিলেন, কিন্তু হঠাৎ রামদাসকে বড় একটা চিনিয়া উঠিতে পারিলেন না, তারপর যখন চিনিলেন—তখন বলিয়া উঠিলেন—"আরে কেরে, রামদাস, তুই কোথা থেকে রে"—পার্শ্ব হইতে কে বলিয়া উঠিল—"এজ্ঞে উনি আমাদের বল্লভপুরের ডাক্তার বাবু।"

সুকুমার বাবু নির্জ্জনে রামদাসের সহিত কথাবার্ত্তা কহিলেন, তাঁহার কাছছাড়া হইয়া রামদাস কোথাও ডাক্তারী কিছু শিখিয়াছিল কি না তাও সুধাইলেন; রামদাস দুই চারিটা কথা লুকাইয়া সমস্তই জানাইল; আরও বলিল, আপনার কম্পাউণ্ডারের নিকট যে দুই একটা রোগের চিকিৎসা শিখিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম, সেই রোগ কটার চিকিৎসার সময়ই একটু একটু গোল বাধে, মনে হয়, যেন ভুল হইতেছে, কিন্তু বাকি সকল রোগের চিকিৎসাই চক্ষু বুজিয়া অনায়াসে করিয়া যাই। সুকুমার বাবু যাইবার সময়ে বলিয়া গেলেন "যাই করিস্ দেখিস্ যেন বাড়ীর বা আত্মীয় বন্ধুর চিকিৎসা করিস্নে"—তার উত্তরে রামদাস

বলিয়াছিল, "আজ্ঞে না—মাতাঠাকুরাণীর কাল হওয়া পর্য্যন্ত আর আপনার লোকের চিকিৎসায় হাত দিই না"।

বীণা।

১

অন্ধকার শব্দহীন জড় কারাগারে
রুদ্ধ এ পরাণ মোর,
সূর্য্যের কিরণ কভু পশিয়া সেথায়
করে না আঁধার ভোর।
সঙ্কীর্ণ এ কারামাঝে শুধু আমি আছি,
আর কিছু সেথা নাই ;
অনিরুদ্ধ পথ যেই সর্ব্বগ আকাশ
তাহাও না পায় ঠাঁই।
জড়বৎ পড়ে' আছি জড়ের মাঝারে,
বুঝিতে পারিনে ভাল—
অন্ধকার শব্দহীন কারার বাহিরে
আছে কি সঙ্গীত আলো ?
আছে কি সৌন্দর্য্য প্রেম, পূর্ণ স্বাধীনতা,
অনন্ত অসীম আশা ?
ব্যক্ত করিবার তরে ব্যাকুল বাসনা,
আছে কি কোথাও ভাষা ?

হৃদয়ের গান যেথা জড় প্রতিঘাতে
কাঁদিয়া আসে না ফিরে ;
অচেতন জড় বাধা না পারি ভাঙ্গিতে,
কাঁদে না হৃদয়তীরে ?
আছে কি সে স্থান যেথা অসীম আকাঙ্ক্ষা
ক্ষুদ্র অসীমের মাঝে
প্রতি পদে বাধা পেয়ে, চির কারারুদ্ধ,
আপন মর্ম্মে না বাজে ?

২

মাঝে মাঝে একদিন না জানি কেমনে
কোন্ মায়াবী কুহকে,
কোথা হতে হৃদিমাঝে সৌন্দর্য্য পশিয়া
ভরিয়া দেয় পুলকে !
প্রেয়সীর করস্পর্শ যেন দেহপরে
স্বপনে পড়ে গো আসি',
প্রেয়সীর প্রেমদৃষ্টি বিরহী নয়নে
সহসা আসে গো ভাসি'।
যেমন লুকান প্রেম ফুলের হৃদয়ে
লাগি' সন্ধ্যার বাতাস
মধুর সৌরভরূপে উচ্ছ্বসিত হয়ে
নিজেরে করে প্রকাশ।
এ কুহকবলে মোর অন্ধকারাগার
আপনি টুটিয়া যায় ;
উন্মুক্ত পরাণ মোর সঙ্গীত আকারে
জগৎ প্লাবিয়া দেয়।

মহাকাশ ব্যাপ্ত করি' ভরি' চন্দ্রালোক
ভ্রমি' তারায় তারায়,
আলোকের বহির্দ্দেশে মহাশূন্য যেথা
অশ্রান্ত ছুটি বেড়ায়।

৩

সহসা ভাঙ্গিয়া যায় কুহক ক্ষমতা
স্বপনের মায়াসম,
সহসা আবার দেখি জড় কারাগারে
আবদ্ধ হৃদয় মম।
মেঘমধ্যে অবরুদ্ধ বিদ্যুৎ যেমন
সব টুটি' বাহিরায়,
এক মুহূর্ত্তের তরে জগৎ চমকি'
অন্ধকারে মিশে যায়,
তেমনি এ প্রাণ মম ক্ষণেকের তরে,
না জানি কিসের বশে
সকল বন্ধন ভাঙ্গি বাহিরিয়া হায়,
পুনঃ কারাগারে পশে।
আবার আবার হায় সেই কারামাঝে
রুদ্ধ এ পরাণ মোর,
আশাহীন প্রাণ শুধু অনুভব করে
ভীষণ আঁধার ঘোর।
মাঝে মাঝে ভ্রম হয় জড় ছাড়া বুঝি
জগতে কিছুই নাই,
আমি যেন আমি নই জড়ের পীড়নে
জড় মাঝে মিশে যাই।

৪

কবি,

তোর এই দেহমাঝে জড় কারাগারে
অবরুদ্ধ যে পরাণ,
তোরেও শুধাই আমি জানিস্ কি তুই
কেমনে কে গাহে গান?
অশরীরী হয়ে যবে কামরথে চড়ি'
তুলিস্ স্বর্গের ফুল,
বলিতে পারিস্ তুই কাহার কুহকে
ছাড়ি' সীমাবদ্ধ কূল
অসীমের রাজ্যপানে উড়ে চলে যাস্
অনন্তে হইতে হারা!
সৌন্দর্য্যের রাজ্যমাঝে প্রবেশি, হইতে
প্রেম মদে মাতোয়ারা?

কবি,

বীণার (ই) মতন তুই! কেমনে কে জানে
কোন্ নিরুদ্দেশ হতে
কাহার কুহক তোরে ভাঙ্গি' কারাগার
নিয়ে যায় স্বর্গপথে!

সাময়িক সারসংগ্রহ।

সম্মোহন-তত্ত্ব।

আজকাল সম্মোহন-তত্ত্ব লইয়া যুরোপে খুব আন্দোলন চলিতেছে। প্রথম, মেস্‌মের্ নামক একজন পণ্ডিত এই বিষয়ের

আলোচনা আরম্ভ করেন। তিনি বলিতেন, একপ্রকার তরল পদার্থ বিশ্বময় ব্যাপ্ত হইয়া আছে—সেই পদার্থ মানব-দেহেও বর্ত্তমান। এই পদার্থ যাহার শরীরে অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে আছে, সে আপন অপেক্ষা হীনতর ব্যক্তির উপর প্রভাব প্রকটন করিয়া তাহাকে বশ করিতে পারে—সেই প্রভাবের নাম তিনি "প্রাণীদেহের চুম্বক-শক্তি" রাখিয়াছিলেন। কিন্তু আজকাল অধিকাংশ য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ এ কথা বড় মানিতে চাহেন না—মেস্‌মেরিজমে যে একটা রহস্যময় আবরণ ছিল, সেই আবরণটি উদ্ঘাটিত করিয়া, ভেল্কির রাজ্য হইতে উদ্ধার করিয়া, উহাকে তাঁহারা চলিত ঘটনার সামিলে আনিতে চাহেন। তাই মেসমেরিজমের পরিবর্ত্তে তাঁহারা হিপ্‌নটিজম এই শব্দ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। হিপ্‌নটিজমের ঠিক্ অনুবাদ—সুপ্তিতত্ত্ব। অর্থাৎ তাঁহারা বলিতে চাহেন, নিদ্রা, স্বপ্ন প্রভৃতি যেরূপ স্বাভাবিক ব্যাপার ইহাও তদনুরূপ। ফলতঃ ইহা একপ্রকার কৃত্রিম উপায়ে নিদ্রা বা স্বপ্ন প্রবর্ত্তন করা। এ নিদ্রা একপ্রকার সজাগ নিদ্রা এবং ইহা কতকটা স্নায়ু-বিকারের ফল। তাই হিপ্‌নটিজমের অনুবাদে উপসুপ্তিতত্ত্ব বলিলে বোধ হয় অসঙ্গত হয় না।

মেস্‌মেরিক সম্মোহনে, মুখের সাম্‌নে হস্ত সঞ্চালন করিয়া নিদ্রা আকর্ষণ করাই চলিত পদ্ধতি—কিন্তু আধুনিক উপসুপ্তি-প্রবর্ত্তকেরা এ পদ্ধতিটি বড় অবলম্বন করেন না।

উপসুপ্তি সঞ্চার করিবার তাঁহাদের দুইপ্রকার প্রণালী আছে। দুইটি পরীক্ষা-বিবরণ এস্থলে আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলেই পাঠকগণ সহজে বুঝিতে পারিবেন সেই দুই প্রণালী কিরূপ। জর্ম্মান পণ্ডিত মল পরীক্ষা করিতেছেন।

(১) "২০ বৎসর বয়স্ক একটি যুবকের উপর পরীক্ষা করিতেছি। তাহাকে একটা চৌকিতে বসিতে বলিলাম এবং তাহার হস্তে একটা বোতাম দিয়া বলিলাম—এই বোতামটির দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া থাক। তিন মিনিটের পরে তাহার চোখের পাতা ঢলিয়া পড়িল; হাজার চেষ্টা করিয়াও চোখ খুলিতে পারিল না! এতক্ষণ বোতামটি সে খুব শক্ত করিয়া ধরিয়াছিল—এক্ষণে তাহার হস্ত শিথিল হইয়া হাঁটুর উপর এলাইয়া পড়িল। আমি তাহাকে বলিলাম তুমি কিছুতেই চোখ্ মেলিতে পারিবে না—সে চোখ্ মেলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল কিন্তু পারিল না—ইত্যাদি।

(২) "একজন ৪১ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তি চৌকিতে বসিল। আমি তাহাকে বলিলাম, তোমার ঘুমাইবার চেষ্টা করিতেই হইবে। ক্রমাগত এই ভাবো যে তোমার ঘুমাইতে হইবে—এ ছাড়া আর কিছু ভাবিও না। এখন তোমার চোখ বুজিয়া আসিতেছে; তোমার চোখের পাতা ক্রমশঃ ক্লান্ত হইয়া আসিতেছে। তোমার চোখের পাতা ঈষৎ কাঁপিতেছে—তোমার সমস্ত দেহে শ্রান্তি বোধ হইতেছে, একটা ভার বোধ হইতেছে, একটা ঘুমের ভাব আসিতেছে—এই তোমার চোখ্ বুজিল; তোমার মাথায় জড়তা আসিতেছে—তোমার চিন্তা সকল ক্রমশঃ গোলমেলে হইয়া আসিতেছে। আর তুমি ঘুম চাপিতে পারিতেছ না—এই তোমার চোখ্ বন্ধ হইল—এখন ঘুমাও। সে চক্ষু বুজিলে আমি তাহাকে বলিলাম, এখন চোখ খুলিতে পার কি? (চোখ্ খুলিতে চেষ্টা করিতে লাগিল—কিন্তু পারিল না) আমি তাহার বাম হস্ত তুলিয়া ধরিয়া ছাড়িয়া দিলাম। (হাত সেইখানেই রহিল, হাজার চেষ্টাতেও হাত নাবাইতে পারিল না)।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ঘুমাইয়াছ কি? উত্তর—হাঁ ঘুমাইয়াছি। একেবারে ঘুমাইয়া পড়িয়াছ?—উত্তর—হাঁ। ঐক্যতান বাদ্য শুনিতে পাইতেছ কি? উত্তর—"পাইতেছি বৈকি"। একটা কাল কাপড় তাহার হস্তে দিয়া বলিলাম—এইটা যে কুকুর হাত দিয়া স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারিতেছ তো? উত্তর "স্পষ্ট পারিতেছি"। এখন তুমি চোখ্ খুলিতে পার—চোখ্ খুলিলে কুকুরকে স্পষ্ট দেখিতে পাইবে। তাহার পর তুমি ঘুমাইয়া পড়িবে এবং যতক্ষণ না আমি বলিব ততক্ষণ আর উঠিবে না। (সে চোখ্ খুলিল, কল্পিত কুকুরের পানে তাকাইয়া তাহার গায়ে হাত বুলাইতে লাগিল) আমি সেই কাল কাপড়টা তাহার হাত হইতে লইয়া মাটিতে বিছাইয়া দিলাম। (সে দাঁড়াইয়া তাহাকে ধরিবার জন্য হাত বাড়াইতে লাগিল।) তাহার পর আমি তাহাকে বলিলাম যে,সে এক্ষণে পশু-শালার উদ্যানে আছে—যদিও আমার ঘরে ছিল, সে তাহাই বিশ্বাস করিল—বৃক্ষাদি দেখিতে লাগিল ইত্যাদি।"

অতএব দেখা যাইতেছে প্রথম প্রণালীতে একটা বস্তুর উপর দৃষ্টি স্থির রাখিয়া মনোনিবেশ করিতে বলা হয় এবং দ্বিতীয় প্রণালীতে ঘুমের ভাব কথার দ্বারা মনে উদ্রেক করিয়া দেওয়া হয়। আমাদের যোগীরা ভ্রূমধ্য-বিন্দুতে লক্ষ্য নিবদ্ধ করিয়া আপনাকে আপনি এইরূপে সম্মোহিত করিতেন—ইহাকে স্বকৃত-উপসুপ্তি বলা যাইতে পারে। উপসুপ্তি-তন্ত্রের মূলমন্ত্র হচ্চে উপসুপ্তাবস্থায় কোন উপায়ে কল্পনা উত্তেজিত করিয়া দেওয়া—কথা কিম্বা ভাব-ভঙ্গির দ্বারা কোনপ্রকার ধারণা মনে উদ্রেক করিয়া দেওয়া। তৎকালে মনে যে ধারণার উদ্রেক হয় তাহাতেই ধ্রুববিশ্বাস জন্মে— এবং উপসুপ্ত ব্যক্তি সেই বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করে।

উপসুপ্ত ব্যক্তি উপসুপ্তি-প্রবর্ত্তকের কথার নিতান্ত বাধ্য—তিনি যাহা বলেন সে তাহাই করে। স্বকৃত উপসুপ্তির আর এক দৃষ্টান্ত—মন্দির-প্রাঙ্গণে রোগী ব্যক্তির স্বপ্নৌষধ-লাভ। আমাদের এখানে তাড়কেশ্বরের মন্দিরে রোগীরা হত্যা দেয়—হত্যা দিয়া কখন কখন স্বপ্নৌষধি লাভ করে। সেই স্বপ্নৌষধিতে যে উপকার হইতে পারে তাহাতে আশ্চর্য্য নাই। পুরাকালে গ্রীকদিগের মধ্যেও এই পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। রোগী ব্যক্তি নিরশন থাকিয়া এক মনে আপনার শারীরিক অবস্থার বিষয় ভাবিতে থাকে—অধিক কাল নিরশন থাকিলে একটু না একটু স্নায়ু-বিকার স্বভাবতই উপস্থিত হয়—তাহার উপর আবার একাগ্রচিন্তা—ইহাতে করিয়া উপসুপ্তাবস্থা সহজেই উৎপন্ন হয়; এই সময়ে যে ঔষধির বিষয় স্বপ্ন দেখা যায় তাহাতে সহজেই ধ্রুব বিশ্বাস জন্মে। এইরূপে যে ঔষধ ধ্রুববিশ্বাসের সহিত সেবন করা যায় তাহাতে রোগ আরোগ্য হইবারই কথা। আজকাল যুরোপের ডাক্তারেরা উপসুপ্তি-প্রবর্ত্তন দ্বারা অনেক রোগ আরোগ্য করিবার চেষ্টা করিতেছেন এবং তাহাতে কৃতকার্য্যও হইতেছেন। যে সকল রোগ স্নায়ু-ঘটিত তাহাই বিশেষরূপে এই পদ্ধতির দ্বারা প্রশমিত হয়। অনেকের পানরোগ এই পদ্ধতির দ্বারা আরোগ্য হইয়াছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ধারণা উদ্রেক করিয়া দেওয়াই উপসুপ্তি-তত্ত্বের মূলমন্ত্র—সেই ধারণা যে শুধু উপসুপ্তাবস্থাতেই থাকে তাহা নহে—উপসুপ্তি ভাঙ্গিয়া গেলেও সেই ধারণা কাজ করে। মনে কর, উপসুপ্তি-প্রবর্ত্তক উপসুপ্ত ব্যক্তিকে বলিলেন—তোমার মদ ভাল লাগে না—না?—সে বলিল "না"। তুমি জাগ্রত হইলেও তোমার মদ ভাল লাগিবে না—না? সে বলিল "না"। বাস্তবিকও সে জাগিয়া উঠিয়া এই ধারণানুসারেই কাজ করে।

তাহার মদ খাইতে আর ভাল লাগে না। উপসুপ্তিতত্ত্বে এইরূপ ধারণার উদ্রেককে উত্তর-ধারণার উদ্রেক বলে। যাহার প্রকৃতিতে ধারণার উদ্রেক-শীলতা অধিক, সেই উপসুপ্তি-প্রক্রিয়ার অনুকূল পাত্র। সকল প্রকৃতিতে উপসুপ্তি সমানরূপে কার্য্যকরী হয় না। অনেকে মনে করে, যাহারা দুর্ব্বল, যাহাদের ইচ্ছার জোর নাই তাহারাই বুঝি সহজে উপসুপ্তির অধীন হয়। কিন্তু এ কথা ঠিক্ নহে। যাহারা মনস্থির করিতে পারে, একাগ্রচিত্ত হইতে পারে তাহাদের উপরেই বরং এই প্রক্রিয়া অধিক ফলবতী হয়। উপ-সুপ্তি-প্রক্রিয়ার দ্বারা যেরূপ লোকের মনকে ভালর দিকে লইয়া যাওয়া যায় সেইরূপ খারাপ দিকেও প্রবৃত্ত করা যাইতে পারে। এই উপসুপ্তি-প্রক্রিয়ার দ্বারা য়ুরোপে মধ্যে মধ্যে বদ্‌মাইশিও হইয়া থাকে। আদালতের বিচারে অনেক সময়ে প্রকাশ হইয়াছে যে,কোন ব্যক্তি উপসুপ্তি-প্রবর্ত্তকের আদেশক্রমে কোন বদমাইশি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে—স্বেচ্ছাক্রমে সে কাজ করে নাই। কিরূপ আইন করিলে এই প্রকার ঘটনা নিবারণ হইতে পারে সেই বিষয়ে য়ুরোপে আজ কাল্ আন্দোলন চলিতেছে। সম্মোহন-তত্ত্বকে এখন আর গাঁজাখুরি বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। জর্ম্মনি দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে যেমন অন্যান্য বিজ্ঞান সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়া হয় সেইরূপ উপসুপ্তিতত্ত্ব বিষয়েও রীতিমত বক্তৃতা হইয়া থাকে।

ভাষা শিখিবার হদিশ।

মসিয়ো গুয়্যাঁ নামক এক জন ফরাসিস পণ্ডিত, "ভাষা শেখা ও শিখাইবার হদিশ" নামক একখানি পুস্তক লিখিয়া-

ছেন। এই পুস্তকখানি সম্প্রতি ইংরাজিতে অনুবাদিত হইয়াছে। তিনি বলেন, দুই তিন বৎসরের শিশুরা যে-কোন বিদেশীয় ভাষা ছয় মাসের মধ্যে শিখিতে পারে। তাহারা ব্যাকরণ পড়ে না, বর্ণমালাও সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে পারে না, কথা বানান করিতে পারে না—কিন্তু চলন-সই কথা কহিতে পারে ও বুঝিতে পারে। নিতান্ত অবোধ শিশু যদি ছয়মাসের মধ্যে একটা বিদেশীয় ভাষা শিখিতে পারে, তবে একজন পূর্ণ-বয়স্ক ব্যক্তি সেই সময়ের মধ্যে কেন না শিখিতে পারিবে? তাহার সহজ উত্তর এই। শিশু কান দিয়া কথা শেখে এবং চোখ্ দিয়া যাহা দেখে তাহার সহিত শোনা-কথাগুলি মিলাইয়া লয়। শিশু ঘটনাগুলি চক্ষে দেখে এবং তদর্থবাচক কথাগুলি কানে শোনে; এবং এই দুই প্রকরণ একত্র হওয়ায় আনুষঙ্গিকতার নিয়মানুসারে, কথা কহিতে ও বুঝিতে সহজেই সমর্থ হয়। পূর্ণ-বয়স্ক ব্যক্তিরা ইহার ঠিক্ উল্টা পদ্ধতি অবলম্বন করে। তাহারা চক্ষুর সাহায্যে বস্তুর প্রতিরূপ মনোমধ্যে গ্রহণ না করিয়া চক্ষের দ্বারা কথার প্রতিরূপটি মনোমধ্যে বসাইবার চেষ্টা করে। তাহারা কেবল চোখ্ দিয়া কথাগুলি গ্রহণ করে—ইহাতে কান তাহাদের বড় একটা কাজে আইসে না। অতএব শিশুর পদ্ধটিই ভাষা শিখিবার প্রকৃষ্ট পদ্ধতি—গ্রন্থকার ইহা স্থির করিয়া শিশুরা কিরূপে ভাষা শিক্ষা করে তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন আলোচনা করিয়া কতকগুলি মূল সূত্র নির্দ্ধারিত করিলেন। এই মূল সূত্রের উপর তাঁহার ভাষা-শিক্ষা-প্রণালী প্রতিষ্ঠিত এবং এই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া তিনি বিলক্ষণ সফলতা লাভ করিয়াছেন।

সেই মূল সূত্রগুলি এই :—

(১) শিশুরা কতকগুলি ছাড়া-ছাড়া কথার দ্বারা ভাষা শিক্ষা করে না, পরন্তু পূর্ণাবয়ব বাক্যপরম্পরা দ্বারা ভাষা শিক্ষা করিয়া থাকে।

(২) বাক্যের দ্বারা যদি ভাষা শিখিতে হয়, তবে ক্রিয়া-পদের উপরেই বেশি ঝোঁক্ দেওয়া আবশ্যক। কারণ ক্রিয়া-পদটিই প্রত্যেক বাক্যের প্রাণস্বরূপ।

(৩) কতকগুলি বাক্যপরম্পরা মনে রাখিবার জন্য শিশু তদর্থবাচক ঘটনাগুলি যেরূপ পরে পরে ঘটিতে দেখে তাহারই ছবি মনোমধ্যে স্পষ্ট করিয়া অঙ্কিত করিয়া লয়।

ভাষা-শিক্ষার এই রহস্যটি কি করিয়া তাঁহার মনোমধ্যে উদয় হইল গ্রন্থকার তাহারও আনুপূর্ব্বিক বিবরণ দিয়াছেন। তিনি জর্ম্মণ ভাষা আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। প্রথমে তিনি মনে করিলেন, জর্ম্মণ ভাষার ব্যাকরণ আয়ত্ত করিতে পারিলেই তিনি জর্ম্মাণ ভাষা শিখিতে পারিবেন। এই উদ্দেশে তিনি জর্ম্মাণ ভাষার ব্যাকরণ দশ দিনের মধ্যে একরূপ বেশ আয়ত্ত করিয়া লইলেন। কিন্তু হ্যাম্‌বর্গের বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সেখানকার আচার্য্যদিগের বক্তৃতার মর্ম্ম কিছুই গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না। যে ব্যভিচারী ক্রিয়া-পদ-গুলি এত কষ্টে তিনি কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন তাহার একটিও তিনি বক্তৃতার মধ্যে ধরিতে পারিলেন না। তাই তিনি মনে করিলেন, ভাষার মূল ধাতুগুলি ভাল করিয়া আলোচনা করিয়া দেখা যাক্। এই অভিপ্রায়ে জর্ম্মাণ ভাষার ধাতুগুলি তিনি বিলক্ষণরূপে আয়ত্ত করিলেন। মনে করিলেন এইবার ভাষা-শিক্ষার হদিশ পাইয়াছেন। এক্ষণে উৎফুল্ল হইয়া আবার সেই বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু বক্তৃতাস্থলে গিয়া দেখেন

এখনও পূর্ব্ববৎ—কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না। অতঃপর, এই সমস্ত পদ্ধতি ছাড়িয়া দিয়া, তিনি নাপিতের দোকানে যাতায়াত আরম্ভ করিলেন, সেখানকার খদ্দেরদিগের কথাবার্ত্তা শুনিয়া দুই চারিটা দস্তুরমত ভদ্রতার বুলি শিখিলেন, কিন্তু কতকগুলি খাপ-ছাড়া বুলি শিখিয়া বিশেষ কিছু ফললাভ হইল না। এক্ষণে তিনি অভিধানের সাহায্যে গেটে ও শিলরের রচনাবলী হইতে অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহাতেও বিশেষ কোন কাজ হইল না। বিরক্ত হইয়া অনুবাদ ছাড়িয়া দিলেন। এবার "অলেণ্ডর্ফ" ধরিলেন। একমাসের মধ্যে অলেণ্ডর্ফের সমস্ত পাঠগুলি শেষ করিলেন, শেষ করিয়াও দেখেন কথাবার্ত্তা চালাইতে পারিতেছেন না—সে বিষয়ে এখনও ঠিক পূর্ব্ববৎ। তিনি সমস্ত অভিধান কণ্ঠস্থ করিবার চেষ্টা করিলেন—কৃতকার্য্যও হইলেন। তবুও ভাষার হদিশ পাইলেন না। পরে হতাশ হইয়া ফ্রান্সে প্রত্যাগমন করি-লেন। গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র তাঁহার একটি আড়াই বৎসরের ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁহার সঙ্গে খুব কথা জুড়িয়া দিল। পাকা পাকা কত কথাই বলিতে লাগিল। তিনি মনে করিলেন, এ যেমন অনর্গল ফরাসি ভাষায় কথা কহিতেছে, আমি যদি ইহার মত জর্ম্মাণ ভাষায় কথা কহিতে পারি, তাহা হইলে কি সুখেরই বিষয় হয়। এই ভাবিয়া তিনি স্থির করিলেন, জীবনের কোন একটি নূতন ঘটনা প্রকাশ করিবার সময় এই শিশুটি কি-প্রকার প্রণালী অবলম্বন করে, তলে তলে তাহা অনুধাবন করিয়া দেখিতে হইবে। একদিন তাহার মাতা, তাহাকে যাঁতা-কলের কারখানায় লইয়া যান—শিশুটি তাহার আগাগোড়া তন্নতন্ন করিয়া দেখিতে লাগিল ও তদ্বিষয়ে নানা প্রশ্ন করিতে লাগিল এবং সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া বিস্মিত হইয়া বাড়ি

ফিরিয়া আসিল। আমি তাহার উপর চোখ্ রাখিলাম, মনে করিলাম, না জানি উহার মনে কিরূপ চিন্তা চলিতেছে, দেখা যাক্ কি করিয়া আপনার মনের ভাব কথায় প্রকাশ করে। এক ঘণ্টা পরে যাহা যাহা দেখিয়াছিল তাহা সকলের নিকটে বর্ণনা করিবার জন্য সে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। তাহার গল্প বার-বার করিয়া সকলকে বলিতে লাগিল; মধ্যে মধ্যে কথা একটু আধটু বদল হয়—দুই একটা খুঁটিনাটি ভুলিয়া যায়—মনে করিবার জন্য আবার গোড়ার কথায় ফিরিয়া আইসে। এই প্রকারে, একটা তথ্য হইতে তথ্যান্তরে, একটা বাক্য হইতে বাক্যান্তরে স্বাভাবিক ক্রমানুসারে উপনীত হইতে লাগিল। "তার পর" "তার পর" বলিয়া এক একবার থামিতেছে আর এই অবকাশে কথাগুলা মাথার মধ্যে গুছাইয়া লইতেছে; এবং গুছাইয়া লইয়া উচ্চৈঃস্বরে সেই কথাগুলা ব্যক্ত করিয়া বলিতেছে। দেখা গেল, একটি পদের নিকট অনেকক্ষণ ধরিয়া থামিতেছিল—সেই পদটি ক্রিয়া-পদ। গ্রন্থকারের হঠাৎ মনে হইল, এইবার ভাষা-শিক্ষার যথার্থ হদিশ পাইয়াছেন। এই হদিশটি তিনি মনোমধ্যে বেশ করিয়া আয়ত্ত করিয়া আবার জর্ম্মনি দেশে গমন করিলেন। সেখানে গিয়া একটি ভদ্র পরিবারের গৃহে বাসা লইলেন এবং সেই পরিবারের ছেলেদিগকে তিনি ফরাসি শিখাইতে লাগিলেন। বাধ্য হইয়া তাহাদের সঙ্গে জর্ম্মণ ভাষায় তাঁহার কথা কহিতে হইত। এইরূপে অল্পকাল মধ্যেই তিনি জর্ম্মণ ভাষা শিখিয়া ফেলিলেন এবং এতদূর ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন যে, একটা দুরূহ উৎকট দার্শনিক বিষয় সম্বন্ধে বক্তৃতা পর্য্যন্ত দিতে পারিলেন।

দন্ত-রক্ষা।

ডাক্তার মিলার, কলিকাতার একজন প্রসিদ্ধ দন্তরোগ চিকিৎসক, দন্ত সম্বন্ধে একটা পুস্তক বাহির করিয়াছেন।

কিছুকাল পূর্ব্বে, আমাদের পিতামহদের আমলে এইরূপ বিষয় লইয়া বাঙ্গলা ভাষায় আলোচনা করিবার বড় সার্থকতা থাকিত না; সেকালে দন্তরোগ বড় একটা জানা ছিল না। কিন্তু আজকাল সংবাদপত্রে এতপ্রকার 'দন্তচূর্ণে'র বিজ্ঞাপন দেখিতে পাওয়া যায় যে আমাদের দেশেও দন্তের অবনতি আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া আশঙ্কা হয়। এই অবস্থায় এ সম্বন্ধে মিলার সাহেবের বক্তব্য প্রকাশ করিলে নিতান্ত নিষ্ফল না হইবার সম্ভাবনা। ইহাঁর ক্ষুদ্র পুস্তকে যাহা আছে আমরা তাহাই সংক্ষেপ করিয়া দিতেছি।

আসল কথাটা যাহাতে সাধারণ পাঠকের বোধগম্য হয় সেই নিমিত্ত ডাক্তার সাহেব মনুষ্য-দন্তের গঠন সম্বন্ধে দু'এক কথা বলিয়াছেন। দন্ত নিম্নলিখিত কয়টি উপাদানে গঠিত—১। এনামেল (enamel); দন্তের যে ভাগ মাড়ির বাহিরে থাকে, ইহা তাহারই উপরিভাগের শ্বেতচিক্কণ আবরণ। ২। এই আবরণের অন্তর্ভাগে ডেন্টীন (dentine) নামক আসল দন্ত্য পদার্থ। এই ডেন্টীনের মাঝখানটা ফাঁপা এবং উহার মধ্যের গর্ত্ত হইতে চতুর্দ্দিকে এনামেল পর্য্যন্ত অসংখ্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র প্রসারিত। ৩। এই গর্ত্তের মধ্যে দন্তের স্নায়ব অংশটুকু (pulp) রক্ষিত। এই অংশ শুধু মধ্যের গর্ত্তে আবদ্ধ নহে; পূর্ব্বোক্ত সরু সরু ছিদ্র দিয়া সমস্ত ডেন্টীন ব্যাপিয়া রহিয়াছে এবং মাড়ির ভিতর দিয়া শরীরের অন্যান্য স্নায়ুর সহিত ইহার যোগ আছে। ৪। মাড়ির

মধ্যে দন্তের যে অংশ আছে তাহার আচ্ছাদনের নাম সিমেণ্টম (cementum)।

দন্তের কার্য্য সম্বন্ধে ডাক্তার মিলার যাহা বলিয়াছেন তাহা বাহুল্য বিবেচনায়, ডিঙ্গাইয়া একেবারে প্রকৃতপ্রস্তাবে উপনীত হওয়া যাক।

শুধু আমাদের দেশে নহে, সকল দেশেই দেখা যায় যে যত কাল যাইতেছে দন্তের অবস্থা ততই শোচনীয় হইয়া আসিতেছে। কেহ কেহ বলেন যে মনুষ্যশরীরেরও এইরূপ দিন দিন অবনতির লক্ষণ দেখা যাইতেছে এবং ইহার জন্য সভ্যতাকে দোষ দিয়া থাকেন। মিলার সাহেব বলেন যে সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে যে, রোগ বৃদ্ধি হইতেছে তাহা কোন কাজের কথা নহে। এইরূপ মনে হইবার কারণ এই যে পূর্ব্বে যাহারা শারীরিক অপটুতা বশতঃ মোটেই টিঁকিতে পারিত না তাহাদের আজকাল, চিকিৎসা বিদ্যার বিশেষ উন্নতি হওয়াতে, রুগ্ন অবস্থায় বাঁচাইয়া রাখা হইতেছে। এই জন্যই সভ্যতার প্রভাবে রোগের কারণ অনেক পরিমাণে দুরীভূত হইলেও রোগীসংখ্যা বাড়িতেছে।

কিন্তু দন্ত-রোগ সম্বন্ধে স্বীকার করিতে হয় যে উহা বাস্তবিক সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে বিশেষরূপে বাড়িতেছে। য়ুরোপের মধ্যে স্পানিষ পর্ত্তুগীজ প্রভৃতি যে জাতিসকল সভ্যতা-শৃঙ্খলে ভালরূপ ধরা দেয় নাই তাহাদেরই মধ্যে এখনো অক্ষুণ্ণ দন্তপাটি দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরাজ বা মার্কিন, যাহারা আজকাল সভ্যতাক্ষেত্রে সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রসর, তাহাদের শত জনের মধ্যে একজনের সমস্ত দন্ত নির্দ্দোষ দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। ইহার কারণ আর কিছুই নহে—সভ্যতার অবিশ্রাম ঝঞ্ঝটে অনেকগুলি কার্য্য করা হইয়া উঠে না যাহা দন্ত রক্ষার পক্ষে অত্যাবশ্যক।

কি কি আবশ্যক তাহা দন্তরোগের কারণ অনুসন্ধান করিলেই বুঝা যাইবে। কারণ দুই প্রকারের—১। পিতামাতা হইতে আমরা যাহা কৌলিকসূত্রে লাভ করিয়াছি—২। নিজের দোষে আমরা যাহা ঘটাইয়াছি। প্রথমোক্ত কারণ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার নাই। পিতামাতার শারীরিক দুর্ব্বলতা বশতঃ অনেক সময় দন্ত দুর্ব্বল বা অসম্পূর্ণ হয়। ইহার অবশ্য কোন প্রতিকার নাই, তবে বিশেষ সাবধানে নিয়ম পালন করিলে বিপদ-সম্ভাবনা কিছু কম। কখন কখন এমনও হয় যে চোয়াল ছোট হওয়ার দরুণ দন্তগুলি যথেষ্ট স্থান পায় না এবং ঠেসাঠেসিতে পরস্পরকে সম্পূর্ণরূপ পরিণতি লাভ করিতে দেয় না। এ অবস্থায় কোন উপযুক্ত দন্ত-চিকিৎসকের দ্বারা যে কোন একটা দন্ত উৎপাটন করিয়া ফেলিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। ফাঁক ক্রমে আপনা হইতেই বুজিয়া আসে এবং বাকি দন্তগুলি যথেষ্ট স্থান পাইয়া আবশ্যকমত বাড়িতে পারে।

নিজের দোষে অনেক প্রকারে রোগ জন্মিতে পারে। একটা প্রধান কারণ রীতিমত পরিষ্কার না করা। মিলার সাহেবের মতে দন্ত মাজিলেই যে সব সময়ে রীতিমত পরিষ্কার করা হইল তাহা নহে। মুখের মধ্যে কোনরূপ খাদ্যাবশেষের লেশমাত্র উপস্থিত থাকিলে তাহা ক্রমে এক প্রকার জীবাণুর বাসস্থান হইয়া দাঁড়ায়। এই জীবাণুগুলি একবার এনামেল নষ্ট করিয়া ফেলিলে দন্তের স্নায়ব অংশ প্রকাশ হইয়া পড়ে এবং তাহাতে বাতাস লাগিলে অতি তীব্র বেদনা অনুভব হয়। একবার এইরূপ অবস্থা হইলে আর সে দন্তকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করিবার কোন উপায় নাই। তবে আজকাল এইরূপ ভগ্ন-দন্তকে কৃত্রিম উপায়ে সম্পূর্ণ করিয়া লইয়া সকল প্রকার কার্য্য চালান যাইতে পারে।

কিন্তু পরিষ্কার করিবার প্রকৃত উপায় কি ? প্রথমতঃ দন্তের ফাঁকে কোনরূপ বাজে পদার্থ না থাকে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত। দ্বিতীয়তঃ অঙ্গুলিদ্বারা দন্তমার্জ্জন অপেক্ষা দাঁতন করা বা বিলাতী তৈয়ারী বুরুষ * ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। কয়লার গুঁড়ার সাহায্যে অঙ্গুলি কেবল দন্তের উপরিভাগ দেখিতে পরিষ্কার রাখে, কিন্তু দন্তের ফাঁকে ফাঁকে,যেখানে অপরিষ্কার থাকিলে বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা, সেখানে দাঁতন-কাষ্ঠ বা বুরুষের ন্যায় অঙ্গুলির প্রবেশ সম্ভবে না। তাহার পর সহজ উপায়ে যাহা তাড়ান না যায় তাহার নিমিত্ত মিলার সাহেব এক ঔষধ † ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, এই ঔষধ এক মিনিটকাল মুখে রাখিয়া ফেলিয়া দিলে, যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল তাহাতে কোনপ্রকার জীবাণু জন্মাইবার সম্ভাবনা একেবারেই দূরীভূত হইল। অজীর্ণ রোগ-জনিত লালায় যে অম্লরসের সঞ্চার হয় তাহা এই জীবাণু বৃদ্ধির বিশেষ সহায়তা করে এবং কঠিন এনামেলকে কিয়ৎপরিমাণে নরম করিয়া আনিয়া জীবাণুদের আক্রমণের বিশেষ সুবিধা করিয়া দেয়। অতএব আজকাল আপিস ইস্কুল প্রভৃতি কর্ম্মক্ষেত্রে যাইবার জন্য খাবার সময়ে যেরূপ তাড়াহুড় পড়িয়া যায় এবং তজ্জন্য, প্রকাশ্যভাবেই হোক বা অম্লরস আকারেই

---

* মিলার সাহেবের মতে Dr Pierreponte's perfect cleansing brushes সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

† R. Thymol ... ... 1 gr.
Acid Benzoic ... ... 12 grs.
Tinct. Eucalypt. ... 1 dr.
Eau-de-Cologne ... 1 oz.
Oil of Peppermint ... 10 m.
Water add to ... ... 6 oz. Mix.

One teaspoonful in a wineglass of water.

হোক, যে অজীর্ণতা উপস্থিত হয়, তাহারই প্রভাবে বোধ করি এই নূতন রোগ আমাদের দেশ অল্প অল্প করিয়া অধিকার করিতেছে। পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে, এই জীবাণু-বিশিষ্ট লালা বড়ই বিষাক্ত। কুকুর বিড়াল প্রভৃতি কোন ক্ষুদ্র জন্তুর রক্তের মধ্যে এই লালার কিয়দংশ প্রবেশ করাইয়া দিলে সে অল্প সময়ের মধ্যেই মরিয়া যায়। সুতরাং সহজেই বুঝা যায় যে এই লালা খাদ্যের সহিত মনুষ্যশরীরে প্রবেশ লাভ করিলে নানা প্রকার ঔদরিক গোলযোগ ঘটা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। এমনও দুই একবার দেখা গিয়াছে যে, কোন গতিকে ইহা রক্তে প্রবেশ করিয়া মনুষ্যেরও মৃত্যুর কারণ হইয়াছে।

মিলার সাহেবের গ্রন্থ হইতে এই দেখা যাইতেছে যে সাবধানে থাকাই প্রধান উপায়। একবার কোন গতিকে এনামেল নষ্ট হইলে স্বাভাবিক দন্ত আর ফিরিয়া পাইবার যো নাই। তবে সভ্যতার প্রভাবে যেমন স্বাভাবিক দন্ত নষ্ট হইতেছে তেমনি কৃত্রিম দন্ত প্রস্তুত করিবার নূতন কৌশল উদ্ভাবিত হইতেছে। এখন একটি দন্ত ক্ষয় হইয়া গেলে তাহার মধ্যস্থিত স্নায়ব চেতন অংশটুকু বাহির করিয়া দন্তকে সম্পূর্ণ জড় করিয়া ফেলিয়া স্বর্ণ বা অন্য প্রকার ধাতুর দ্বারা সেই গর্ত্ত পুরাইয়া দিলে দেখিতেও কোন প্রভেদ পাওয়া যায় না কার্য্যও বেশ চলিয়া যায়। এবং সভ্যতার যখন দোষ দেওয়া হইয়াছে তখন এইটুকু প্রশংসাও করা উচিত যে, পূর্ব্বে যেরূপ, বৃদ্ধদের স্বাভাবিক নিয়মানুসারে দন্ত পড়িয়া গেলে, কোন উপায় থাকিত না এখন তাঁহাদের তেমন নিরাশ্বাস হইবার কোন কারণ নাই। কিছু অর্থ ব্যয় করিলেই পূর্ব্বের দন্ত অপেক্ষা সুগঠিত দুইটি দন্তপাটি যে কেহ অনায়াসে পাইতে পারে।

বাল্যবিবাহ।

সম্প্রতি ডাক্তার ষ্ট্র্যাহান সাহেব "বিবাহ ও ব্যাধি" নামক গ্রন্থে বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে মত ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি যাহা বলিয়াছেন, আমরা তাহা নিম্নে সংকলন করিয়া দিলাম।

ডাক্তার বলিতেছেন, নাবালক কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হইলে, সেই চুক্তি জীবনযাত্রায় পক্ষে অত্যাবশ্যক বলিয়া সপ্রমাণিত না হইলে আদালত তাহা কোনমতে গ্রাহ্য করে না। কিন্তু বিবাহ এমন যে গুরুতর চুক্তি, নাবালক কর্ত্তৃক সেই চুক্তি সম্পন্ন হইলেও তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার আর অন্য উপায় নাই। ইহা কি নিদারুণ বিধি নহে!

পিতামাতা প্রভৃতি অভিভাবকেরা অনেক সময়ে পাত্র নির্ব্বাচন করেন সত্য বটে, কিন্তু ইহাঁরা সকল সময়েই যে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেন তাহা স্বীকার করা যায় না। যেখানে আমৃত্যু দৃঢ় বন্ধনে থাকিতে হইবে সেখানে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া জীবনের সঙ্গী খুঁজিয়া না লইলে নানা অশান্তির প্রাদুর্ভাব হইবার খুবই সম্ভাবনা।

যাঁহারা বাল্যবিবাহ সমর্থন করেন, তাঁহারা বলেন, বাল্যবিবাহে বংশবৃদ্ধি লাভ করিয়া সমাজ সতেজ এবং উন্নত হয়। ডাক্তার লিখিতেছেন, বাল্যবিবাহে অত্যাশ্চর্য্য বংশবৃদ্ধি হয় সে কথা সত্য, কিন্তু তাহাতে সমাজের কতদূর শোভাবর্দ্ধন হয় সে বিষয়ে বিস্তর সন্দেহ আছে। বাল্যবিবাহের ফলস্বরূপ রাশি রাশি যে সকল খর্ব্বাকৃতি, বালবৃদ্ধ জীর্ণ মানবসন্তান জন্মগ্রহণ

করে, তাহারা হয় শৈশবেই মানবলীলা সম্বরণ করে, অথবা দুর্ভাগ্যক্রমে যদি টিঁকিয়া যায় ত জীবিকা উপার্জ্জনে অক্ষম হইয়া চৌর্য্যবৃত্তি বা ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে। ইহাকেই যদি সমাজের শ্রীবৃদ্ধি বল, সে স্বতন্ত্র কথা।

বাল্যবিবাহে সমাজে দুর্নীতি এবং চরিত্রহীনতার প্রতিরোধ হয়, এইরূপ মতও আজকাল শুনা যায়। কিন্তু এই দুর্নীতি কোথায় সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ পাপমূর্ত্তিতে বিরাজ করে! অপ্রাপ্তবয়স্ক অবিবাহিত মানবসমাজে, না বাল্যবিবাহপ্রসূত অশিক্ষিত হতভাগ্য মানব-কীটের মধ্যে! বাল্যবিবাহ করিয়া অসংযত বংশবৃদ্ধিপূর্ব্বক সমাজকে ব্যাধি-নিলয় করিয়া তোলা কি দুর্নীতি নহে!

ইহার পরে ডাক্তার মহাশয় বাল্যবিবাহে জীবনীশক্তির কিরূপে হ্রাস হয়, তাহার আলোচনা করিয়াছেন।

জীবশ্রেণীর মধ্যে দেখা যায়, পিতামাতার জীবনীশক্তি সন্তানসন্ততিতে সঞ্চারিত হয়। এই জীবনীশক্তি রোগ, শোক, বার্দ্ধক্য দুরাচার প্রভৃতি নানা কারণে হ্রাস হইয়া আসে, অথবা স্বতঃই ইহা ক্ষীণভাবাপন্ন থাকে—যেমন অপূর্ণ বাল্যাবস্থায়। অতএব, বাল্যবিবাহে যে সকল সন্তানসন্ততি জন্মলাভ করে, জীবনীশক্তির অল্পতাপ্রযুক্ত তাহারা চির-রুগ্ন এবং জীবনযাত্রার সম্পূর্ণ অনুপযোগী হয়।

নিম্নশ্রেণীস্থ জন্তুদিগের মধ্যে দেখা যায়, অপূর্ণ অপরিপুষ্ট অবস্থায় যে সকল শাবক উৎপন্ন হয়, তাহারা প্রায়ই হ্রস্বাকার, নিস্তেজ এবং বিকলাঙ্গ হয়, এইনিমিত্ত যাহারা যৌন-সম্বন্ধে অশ্ব গো প্রভৃতির উৎকর্ষ সাধন করিয়া থাকে, তাহারা উক্ত জন্তুরা যতদিন না পূর্ণাঙ্গতা প্রাপ্ত হয়, ততদিন তাহাদের মধ্যে

মিলন সজ্ঘটন করায় না। ডাক্তার নিজে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, কোন একটি শূকর অপূর্ণাবস্থায় যে সকল শাবক প্রসব করে, তাহাদের মধ্যে সকলেই জন্মিবার পাঁচ সপ্তাহ মধ্যে মারা পড়িল। কিন্তু ঐ শূকর পূর্ণাঙ্গতা প্রাপ্ত হইয়া আবার যখন প্রসব করিল তখন শাবকেরা বেশ সুস্থ, সবল এবং দেখিতে সুশ্রী হইল। গৃহপালিত কুকুরের সর্ব্বপ্রথম শাবকেরা জীবন্মৃত হইয়া কোন কাজে আসে না বলিয়া অনেক সময়ে তাহাদিগকে মারিয়া ফেলা হয়।

বয়ঃপ্রাপ্ত অপেক্ষা অপ্রাপ্তবয়স্ক পিতামাতার সন্তানসন্ততি যে অনেকাংশে হীন হয়, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে। আরিষ্টট্‌ল্ বলেন, গ্রীসের কোন কোন বিভাগে বাল্যবিবাহ প্রচলিত থাকায় সেখানকার লোকেরা অত্যন্ত হ্রস্বকায় ছিল। ফ্রান্সে এক সময়ে সৈন্যশ্রেণীভুক্ত হইবার ভয়ে অনেকে যখন বাল্যবিবাহ করিল, তখন কীটের ন্যায় দ্রুত বংশবৃদ্ধি হইতে লাগিল, কিন্তু সন্তানসন্ততিরা সাঙ্ঘাতিক রোগ লইয়া জন্মগ্রহণ করিল। ১৮১২-১৩ খৃষ্টাব্দেও ফ্রান্সে বাল্যবিবাহের শোচনীয় ফল ফলিয়াছিল।

বাল্যবিবাহপ্রসূত সন্তানসন্ততিরাই যে কেবল অন্ধ, খঞ্জ, উন্মাদ এবং উৎকট রোগাক্রান্ত হয় তাহা নহে, প্রসূতি মাতারও সমূহ বিপৎপাতের সম্ভাবনা থাকে। ডাক্তার ম্যাথিউস্ ডন্‌কান্ বলেন, গর্ভনষ্ট, যমক ও মৃতসন্তানপ্রসব প্রভৃতি স্ত্রীলোকদের যে সকল বিপদ আছে, বাল্যবিবাহই তাহার সর্ব্বপ্রধান কারণ। বাল্যবিবাহ যদি সমাজ হইতে উঠিয়া যায়, তাহা হইলে কত যে শিশু-জননী অকাল মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায় তাহা বলা যায় না।

অল্পবয়স্ক পিতামাতার সন্তানসন্ততিরা প্রায়ই দুঃসাহসিক হয় না, বিজ্ঞ ম্যারো ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। এই নিমিত্ত ইহাদের মধ্যে হত্যাকারী অপেক্ষা চোর প্রতারকের সংখ্যা এত অধিক। জোসেফ করসিও অনেক অনুসন্ধানের পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

ইংলণ্ডে কলকারখানার মজুরদের মধ্যে বাল্যবিবাহ সর্ব্বাপেক্ষা প্রচলিত। বার চৌদ্দ বৎসর বয়সের বালকবালিকা যাহাদের একবেলা অন্ন জুটে না, অজ্ঞানতাবশতঃ তাহারা বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হয় এবং অল্পকালের মধ্যে বহু সন্তানসন্ততি উৎপন্ন করিয়া জীবনকে অসহ্য করিয়া তোলে। বদ্ধবায়ুসেবন, মদ্যপান, ব্যভিচার প্রভৃতিও যে এই রুগ্নসন্তান উৎপাদনের অন্যতম কারণ তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

ইংলণ্ডে রেজিষ্ট্রার জেনেরাল সাহেব ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের বিবাহের যে তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন, ষ্ট্র্যাহান সাহেব তাহা হইতে বাল্যবিবাহের সংখ্যা উদ্ধৃত করিয়াছেন। পুরুষদিগের মধ্যে ৩৫৭৬ জন উনিশ বৎসর বয়সে, ৭২৮ জন আঠার বৎসর বয়সে, ৫৯ জন সতের বৎসর বয়সে এবং ৩ জন ষোল বৎসর বয়সে বিবাহ করে। স্ত্রীলোকদের মধ্যে ১৪৭২ জন সতের বৎসর বয়সে, ১৬৭ জন ষোল বৎসর বয়সে এবং ২০ জন পনের বৎসর বয়সে বিবাহ করে। ইহারা অধিকাংশই কলকারখানার মজুর। এই সকল বিবাহের ফল কল্পনা করিতে গেলেও শিহরিয়া উঠিতে হয়।

পরিশেষে ডাক্তার বলিতেছেন, ইংলণ্ডে প্রচলিত আইন যখন ষোল বৎসর অপেক্ষা ন্যূনবয়স্কা বালিকা অযথা সংসর্গে সম্মতি প্রদান করিতে অনুপযুক্তা বলিয়া ধার্য্য করিয়াছে, তখন ঐ

বালিকা বিবাহে সম্মতি দান করিতে উপযুক্তা বলিয়া কিসে স্থির হইল! স্ত্রীজাতি আঠার বৎসর বয়সের নীচে এবং পুরুষজাতি কুড়ি বৎসর বয়সের নীচে বিবাহ না করিতে পারে এইরূপ আইন হওয়াই সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়।

কালিদাসের চিত্রাঙ্কনী প্রতিভা।

অলঙ্কারের নির্দ্দেশানুসারে মহাকাব্য বলিয়া গণ্য হইলেও রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন মহাকাব্যের সহিত কালিদাসের রঘুবংশের একটা বিশেষ প্রভেদ দেখা যায়। সমগ্র গ্রন্থের মধ্যে কোনও মূল ঘটনা বা প্রধান চরিত্রের প্রভাব লক্ষিত হয় না—কেবলি ধারাবাহিক কতকগুলি খণ্ড খণ্ড সম্পূর্ণ চিত্র একমাত্র কুলগৌরবসূত্রে সংযুক্ত। দিলীপ হইতে অগ্নিবর্ণ পর্য্যন্ত ভালমন্দ অনেকগুলি রাজা—কেহ পুত্রাকাঙ্ক্ষায় তপোবনে ধেনু চরাইয়া বেড়ান, কেহ দিগ্বিজয়ী ধনুর্দ্ধর, কেহ প্রিয়বিরহে বিলাপ করিয়া সারা, কেহ পিতৃসত্যপালনার্থে বনে বনে ফিরেন, কেহ বা প্রমদাজনবেষ্টিত হইয়া অহর্নিশি সুরাপানে কালক্ষয় করেন—প্রত্যেকের জীবনের মূল ঘটনা স্বতন্ত্র এবং কালভেদে একের জীবনের সহিত অপরের জীবনের ঘটনার বড় সম্পর্ক নাই। যোগ এই পর্য্যন্ত যে, দিলীপের পুত্র রঘু, রঘুর পুত্র অজ, অজের পুত্র দশরথ, এবং এইরূপে অগ্নিবর্ণ পর্য্যন্ত একটি ধারাবাহিক বংশাবলী।

রামায়ণ মহাভারত এরূপ কুলজী নহে। কুলের কথা তাহাতে অনেক আছে বটে, কিন্তু তাহা প্রসঙ্গক্রমে আসিয়াছে মাত্র।

সমগ্র কাব্যখানি সেই সূত্রে গ্রথিত বলা যায় না। কবির হৃদয়ে মনুষ্যত্বের যে চরম আদর্শ জাগিয়া ছিল সেই আদর্শকে মূর্ত্তি দিয়া তিনি রামকে গড়িয়াছেন। এবং রামায়ণের অন্যান্য চরিত্রগুলিও রামেরই আনুষঙ্গিক।

মহাভারতে ঘটনারও যেমন অন্ত নাই, লোকেরও অন্ত নাই—ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শত ধার্ত্তরাষ্ট্র, সঞ্জয়, বিদুর, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, শ্রীকৃষ্ণ—বিস্তর বড়লোক এবং প্রত্যেকেরই নিজত্ব বিশেষ পরিস্ফুট। কিন্তু এই বিবিধ ছোট বড় ঘটনা এবং বিচিত্র প্রধান অপ্রধান চরিত্রসমাবেশ কুরুক্ষেত্রব্যাপারেরই সূচনা। প্রতি ঘটনা এই মহাপ্রলয়ের পূর্ব্বায়োজন এবং প্রত্যেক ব্যক্তিই প্রলয়ের রঙ্গভূমিতে অভিনেতা।

রঘুবংশের বিষয় পুত্রপৌত্রাদিক্রমে বিবস্বতকুলের বর্ণনা। কোন মূল ঘটনাও নাই, বিশেষ নায়কও নাই, এবং রাজচরিত্রের একটা আদর্শস্থাপন কিম্বা অনুরূপ কোন উদ্দেশ্যও দেখা যায় না। তবে এত বিষয় থাকিতে এক প্রাচীন বংশাবলী বর্ণনায় কবির এত উৎসাহ কেন?

ইহার একটা কারণ এই মনে হয় যে, খণ্ড খণ্ড চিত্ররচনায় কালিদাসের একটু যেন বিশেষ আনন্দ ছিল। শম্বুক যেমন অতি সহজেই আপনার চারিদিকে বিচিত্র চিত্রিত আবরণ নির্ম্মাণ করে, কালিদাসের প্রতিভা তেমনি দেখিতে দেখিতে আপনাকে চিত্রময় শ্লোকে আবৃত করিয়া তোলে। ভবভূতি যেমন মানবপ্রকৃতিকে করুণারসে বিগলিত করিয়া লেখনীমুখে নিঃসৃত করিতে ভালবাসিতেন, কালিদাস তেমনি মানবপ্রকৃতি এবং বহিঃপ্রকৃতিকে চিত্র আকারে পরিস্ফুট করিতে ভালবাসিতেন। রঘুবংশের ন্যায় প্রায়-অসংলগ্ন সর্ব্বপরম্পরায় এই ছবি আঁকিবার

অনেকটা অবসর পাওয়া যায়। একটা চিত্রশালা দেখিয়া আসিলে যেমন মনের ভাব হয় সমস্ত রঘুবংশ পাঠ করিলেও সেই-রূপ হয়। অনেকগুলি ফ্রেমে বাঁধানো ভাল ভাল ছবি।—দিলীপদম্পতির তপোবনে গমন। রঘুর নানা দেশে দিগ্বিজয়। ইন্দুমতীর স্বয়ম্বর। দশরথের মৃগয়াগমন। রামসীতার রথযাত্রা। পরিত্যক্তা অযোধ্যাপুরী। অগ্নিবর্ণের ইন্দ্রিয়সুখসম্ভোগ। এই-গুলি ছবি, বাকি সমস্তই ফ্রেম।

রঘুবংশে চরিত্র যাহা বর্ণিত হইয়াছে তাহা কেবল বর্ণনামাত্র, চরিত্র রচিত হয় নাই। দিলীপের গুণগ্রাম কালিদাস নীতিগ্রন্থ হইতে সঙ্কলন করিয়া লিখিয়াছেন মাত্র—অন্য নৃপতিদিগকেও সর্ব্বাঙ্গীনভাবে জাগ্রত করিয়া তুলিবার তেমন চেষ্টা হয় নাই। কেবল ছবিগুলির প্রতিই কালিদাসের টান।

এবং কালিদাস ক্রমাগতই চিত্রের পর চিত্র সাজাইয়াছেন। অনেক স্থলে একই পথবর্ণনার এক-একটি শ্লোকে এক-একটি চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। দীর্ঘ পথ কখনও গ্রামের প্রান্ত দিয়া কখনও বনের মধ্য দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে—স্নিগ্ধগম্ভীর-নির্ঘোষ এক স্যন্দনে বসিয়া রাজা ও রাণী এই পথে গুরুগৃহে চলিয়াছেন। পথের দুইধারে কোথাও স্যন্দনবদ্ধদৃষ্টি হরিণমিথুন, কোথাও রথনেমিস্বনোন্মুখ ময়ূরদল, গ্রামপ্রান্তে মধ্যে মধ্যে ঘৃতভাণ্ডহস্তে ঘোষবৃদ্ধেরা রথের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হয়—রাজা তাহাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহেন, তাহাদের কুশল জিজ্ঞাসা করেন, রাজদর্শনে প্রীত হইয়া তাহারা গৃহে ফিরে।

এইরূপে সমস্ত দিন অতিবাহিত করিয়া সায়ংকালে রাজা দিলীপ সস্ত্রীক বশিষ্ঠাশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নিরিবিলি তপোবন—কালিদাসের কল্পনার প্রিয় বিহারভূমি। উজ্জয়িনীর

সাহরিকতা হইতে তিনি যেন এইখানে আপন মানসী আশ্রমে আসিয়া বিশ্রামলাভ করেন। কিন্তু এ তপোবনে তপস্যার কঠোরতা বড় নাই—কেবলি একটি পবিত্র হোমধূমাচ্ছন্ন নির্জ্জন গৃহাশ্রম। এখানে ঋষিপত্নীরা ব্রত আচরণ করেন, বিকালবেলায় উটজদ্বারে দাঁড়াইয়া অপত্যবৎ হরিণযূথকে নীবার রোমন্থন করিতে দেখেন, ঋষিকন্যারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটহস্তে আলবালে জলসেক করিয়া থাকেন এবং সেকান্তে আলবালাম্বুপায়ী বিহঙ্গগণের বিশ্বাসের নিমিত্ত দূরে সরিয়া দাঁড়ান। এখানে কেবলি স্নেহ দয়া মায়া, রমণীর শুভ্র কোমলতা—দ্বেষ নাই, হিংসা নাই, সিংহাসন এবং চক্রান্ত নাই—শুধু শান্তি এবং সন্তোষ। কালিদাস ইহাই উপভোগ করেন—সরল হৃদয় এবং পবিত্র প্রীতিভাব, বিকশিত সর্ব্বাঙ্গীন স্বাস্থ্য এবং সুডোল নিটোল গঠন, নিরলঙ্কার রমণীয়তা এবং বল্কলবদ্ধ বিমল যৌবন।

রাজদম্পতি এই তপোবনে পর্ণশালায় থাকিয়া ধেনুর সেবা করেন। প্রত্যহ প্রভাতে নন্দিনীকে লইয়া বনে বাহির হন এবং সায়ংকালে ঝিল্লিমুখরিত বনপথ দিয়া কুটীরে ফিরিয়া আসেন। একদিন সহসা দেখিলেন, নন্দিনী নিকটে নাই—অদূরে শৈলগহ্বরের সম্মুখে এক সিংহ তাহাকে আক্রমণ করিয়াছে—নন্দিনী কাতরদৃষ্টিতে দিলীপের দিকে চাহিয়া। রাজা ধনুতে শরযোজনা করিলেন—কিন্তু নন্দিনীর মায়াপ্রভাবে তাঁহার হস্ত অসাড়—ধনুর্ব্বাণহস্তে যেমনটি তেমনি চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। কালিদাসও চিত্রিতবৎ বর্ণনা করিয়াছেন। এবং কেবল একটি সুন্দর চিত্রহিসাবেই ইহার সৌন্দর্য্য।

অবশেষে নন্দিনী প্রীত হইয়া রাজাকে অভিলষিত বরপ্রদান করিল। গুরু ও-গুরুপত্নীর পাদবন্দনাদি করিয়া সস্ত্রীক দিলীপ

রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন। অল্পদিনমধ্যেই সুদক্ষিণার দোহদলক্ষণ দেখা দিল।

সুদক্ষিণা যখন অন্তঃসত্ত্বা কালিদাস দিলীপের অন্তঃপুরে গিয়া একএকবার মহিষীকে দেখিয়া আসিয়াছেন। এবং গর্ভিণীর পাণ্ডু মুখশ্রী, মন্থরগতি, আলসভাব—পরিপূর্ণা দোহদশ্রী—এক আধটি মৃদু উপমার চিত্রিত করিয়াছেন; কোথাও উষাকালীন ক্ষীণ পাণ্ডু শশীর সাদৃশ্যে; কোথাও বা পুরাতন পত্রাপগমে সমল্প-মনোজ্ঞপল্লবা লতিকার সহিত তুলনায়।

শুধু ইহাই নহে, দু'একটি নিভৃত সুন্দর দাম্পত্যচিত্রও অঙ্কিত হইয়াছে। সন্তানসম্ভাবনায় মহিষীর আদর বাড়িয়াছে—রাজা যখন তখন অন্তঃপুরে আসিয়া প্রিয়াকে জিজ্ঞাসা করেন, কি খাইতে ইচ্ছা করে, কি পরিতে সাধ যায় ইত্যাদি। এবং ঘন ঘন সুদক্ষিণার মৃৎসুরভি আনন আঘ্রাণ করিয়া দিলীপের আর কিছুতেই পরিতৃপ্তি জন্মে না।

এই দোহদচিত্র রঘুবংশে আরও দু'একস্থলে দেখা যায়। রামচন্দ্রও একদিন আলেখ্যগৃহে বসিয়া অঙ্কনিষণ্ণা সীতাকে এমনি করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাঁহার কি সাধ যায়; এবং তদুত্তরে সীতা—বোধ করি, চতুর্দ্দিকের বনবাসবৃত্তান্তালেখ্যদর্শনে—আর একবার সেই ঋষিকন্যাপরিবৃত তপোবনে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

দিলীপ রাজ্যভার হইতে অবসর গ্রহণ করিলে রঘু সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া দেশদেশান্তরে দিগ্বিজয়ে বাহির হইলেন। তখন শরৎকাল। উজ্জল দিন। দূরবিস্তৃত শস্যক্ষেত্রে ইক্ষুচ্ছায়ায় বসিয়া কৃষকাঙ্গনারা গ্রাম্য কবিরচিত রঘুকর্তৃক ইন্দ্রবিজয় গাথা গাহিতেছে। রাজধানী সুরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া শুভদিনে

শুভক্ষণে রঘু সেনাদল সহ যাত্রা করিলেন। পৌরাঙ্গনারা চতুর্দ্দিক হইতে লাজরাশি বর্ষণ করিতে লাগিল।

চতুরঙ্গ সেনা যেখান দিয়া যায় ধূলায় আকাশ ছাইয়া ফেলে। মাতঙ্গকুল শুণ্ডের দ্বারা বড় বড় বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া পথ পরিষ্কার করিতে থাকে—বন উজাড় হইয়া যায়। জয়োল্লাসমত্ত রঘু-সেনা কোথাও পার্ব্বত্যপ্রদেশে পানভূমি রচনা করিয়া তাম্বূল-পত্রপুটে নারিকেলসুরাপানে কালহরণ করে। কোথাও নৌসেতু বাঁধিয়া, কোথাও বা হস্তীপৃষ্ঠে রঘু সসৈন্যে নদী পার হয়েন।

তাহার পর স্বয়ম্বরসভা। ইন্দুমতীর স্বয়ম্বরসভায় ভারতের যত সম্ভ্রান্ত নরপতিগণ উপস্থিত হইয়াছেন, কালিদাস প্রত্যেকের এক একখানি চিত্র আঁকিয়াছেন। এই রাজগণবর্ণনার মধ্যে দু'একটি মৃদুস্পর্শ টান দিয়া রূপসীর রূপের আভাসে তিনি চিত্রগুলিকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন। প্রতিহারিণী সুনন্দা মগধ-ঈশ্বরের বর্ণনা করিতেছে—মগধরাজ বহু যজ্ঞ করিয়া ইন্দ্রকে নিজগৃহে রাখিয়াছেন এবং সেই অবধি বিরহিণী শচীর কেশ-বিন্যাস বন্ধ। দেবাঙ্গনাবাঞ্ছিত অঙ্গদেশাধিপতির বর্ণনা—অঙ্গরাজ যখন শত্রুদিগকে বধ করিলেন, তাহাদের রমণীরা মুক্তাহার ত্যাগ করিয়া কাঁদিতে বসিল এবং মুক্তাফলস্থূল অশ্রুবিন্দু তাহাদের স্তনদেশে পতিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। দুর্ব্বিষহতেজ মথুরাধিপ সুষেণ স্নিগ্ধকান্তি এবং নয়নাভিরাম—জল-ক্রীড়াকালে তাঁহার অন্তঃপুরিকাগণের স্তনচন্দনপ্রক্ষালনে কালিন্দীর নীল জল যেন শুভ্র গঙ্গোর্ম্মিসংসক্ত হইয়া শোভা পায়। ইন্দুমতী একে একে নমস্কারপূর্ব্বক সকলকেই সসম্ভ্রমে প্রত্যাখ্যান করিলেন। ক্রমে অজের নাম; সুনন্দা বলিতে লাগিল—ইঁহারি পিতামহ দিলীপ যাঁহার শাসনে পথিমধ্যে নিদ্রিতা নর্ত্তকীর অঙ্গ-

বসন উড়াইতে বায়ুও সাহস করিত না, পিতা রঘু বিশ্বজিৎ যজ্ঞে মৃণ্ময়পাত্রমাত্র রাখিয়া সমস্ত ঐশ্বর্য্য ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়াছেন, এবং কুলে শীলে রূপে গুণে ও নবীন যৌবনে ইনি তোমার তুল্য বর, ইহাঁকে বরণ কর, রতনে কাঞ্চনে মিলন হউক্। অজের গলদেশে বরমাল্য শোভা পাইল।

কেবলি রূপের তরঙ্গ। কালিদাসের প্রকাণ্ড চিত্রশালায় রূপসীর পর রূপসীর চিত্র সুবিন্যস্ত এবং সমগ্র প্রকৃতি অনুকূল প্রেমে ও সৌন্দর্য্যে অভিব্যক্ত। আমাদের চক্ষের সম্মুখে কেবল একটি চিত্রার্পিত মায়ারাজ্য—রূপযৌবনসমাচ্ছন্ন এবং রমণীয়।

রাজা দশরথ যখন মৃগয়ায় বাহির হইয়াছেন তখন কোথায় অশ্বের হ্রেষারবে, হস্তীর বৃংহিতধ্বনিতে দশদিক্ প্রতিধ্বনিত হইবে, না, কালিদাস স্ত্রী এবং বসন্ত এবং ললিত আদিরসে মৃগয়াকে আচ্ছন্ন করিয়া তুলিয়াছেন। বসন্তকাল, গাছে গাছে নূতন পাতা, ডালে ডালে কোকিলকূজন, ফুলে ফুলে ভ্রমরগুঞ্জন, মৃদু মলয়ানিল, এবং মদনশরজর্জ্জর বিলাসবিভ্রম, পতির সহিত অঙ্গনাগণের বকুলমদ্যপান, ঢলাঢলি গলাগলি। রূপসী নহিলে মৃগয়া হয় না—অধরসুধার উত্তেজনা চাহি, নূপুরনিক্কণের উদ্দীপনা চাহি, মদনশরের পরিচালনা চাহি।

রামায়ণের মৃগয়াবর্ণনা হইতে কালিদাসের মৃগয়াচিত্র সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। রামায়ণে এসকল ললিত বর্ণনা কোথাও নাই। দশরথ যখন মৃগয়ায় বাহির হইয়াছিলেন তখন তিনি যুবরাজ এবং অবিবাহিত। অযোধ্যাকাণ্ডে কৌশল্যার নিকট দশরথ এই মৃগয়াবৃত্তান্ত বলিতেছেন—

"হে দেবি! যে সময়ে আমি যুবরাজ ছিলাম এবং তোমারও বিবাহ হয় নাই, সেই সময়ে একদা আমার ঔৎসুক্যবর্দ্ধক বর্ষাকাল উপস্থিত হইল। সূর্য্য স্বীয় কিরণ-দ্বারা জগৎ উপতাপিত এবং পার্থিব রস সমস্ত শোষিত করিয়া প্রেতগণ-

সেবিত ভীতিপ্রদ দক্ষিণদিক্ অবলম্বন করিলে সদ্যই গ্রীষ্ম অন্তর্হিত হইল এবং স্নিগ্ধ মেঘ সমস্ত দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। তখন ভেক, চাতক ও ময়ূর সকল আনন্দিত হইল; বিহগ সকল বৃষ্টিজলে স্নাত ও ক্লিন্নপক্ষোত্তর হইয়া অতিকষ্টে, বৃষ্টি ও বায়ুবেগে যাহাদিগের অগ্রভাগ আন্দোলিত হইতেছে, তাদৃশ বৃক্ষ সমুদায় আশ্রয় করিতে লাগিল; মত্ত চাতকগণে সেবিত পর্ব্বত পতিত ও পতনোদ্যত জলে আচ্ছাদিত হইয়া তোয়রাশির ন্যায় প্রকাশমান হইল; এবং স্থানে স্থানে বিমল সলিল সমস্ত গৈরিকাদি বিবিধ ধাতুসংযোগে ধূসর, পাণ্ডুর ও অরুণবর্ণ হইয়া, সর্পের ন্যায়, বক্রভাবে পর্ব্বত হইতে ক্ষরিত হইতে লাগিল। সেই অতি-সুখকর বর্ষাকালে রজনীতে আমি অজিতেন্দ্রিয়তা প্রযুক্ত ব্যায়ামাভিপ্রায়ে জল-পানার্থে তীরে সমাগত গজ, মহিষ, মৃগ ও অন্যান্য হিংস্র জন্তু হননে অভিলাষী হইয়া ধনুক ও বাণ ধারণপূর্ব্বক রথে আরোহণ করিয়া সরযূ নদীতে গমন করিলাম। অনন্তর সেই ঘোর অন্ধকারময় অদৃশ্যস্থানে জলমধ্যে গর্জ্জনকারী বারণের শব্দতুল্য কোন ব্যক্তির কুম্ভপূরণের ধ্বনি শ্রবণ করিলাম। পরে গজ-হননেচ্ছু হইয়া সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া এক আশীবিষতুল্য প্রদীপ্ত শর গ্রহণ-পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিলাম।”

রামায়ণের এই মৃগয়াবর্ণনার পার্শ্বে কালিদাসের মৃগয়া সৌখীন ফেসান মাত্র। কালিদাস মৃগয়াবলম্বনে কেবল কতকগুলি সুন্দর চিত্র ফুটাইতে চাহেন বৈ ত নয়। রামায়ণে এই বর্ষাবর্ণনায় বাল্মীকি সেই অন্ধকার কালরাত্রির ভয়ঙ্করী ঘটনার পূর্ব্বসূচনা করিয়াছেন। বাল্মীকির চিত্রে একটি গম্ভীর ভীষণতা ব্যক্ত হয়। কালিদাসের চিত্র উজ্জ্বল এবং মধুর।

ভবভূতি হইলে মুনিপুত্রবধ লইয়া এইখানে অনেক করুণরস উদ্রেক করিতেন। বাল্মীকির পদানুসরণ করিয়া তিনি ঘন বর্ষার একটি গম্ভীর দৃশ্য উদ্ঘাটিত করিয়া দিতেন এবং সেই অন্ধকার দৃশ্যপটে ধনুর্ব্বাণহস্ত দশরথের চিত্র ফুটাইয়া তুলিতেন। এবং বাণবিদ্ধ ঋষিবালকের করুণ বিলাপে শ্রোতৃবর্গের হৃদয় আর্দ্র হইয়া আসিত।

কালিদাস করুণরসে এমন পটু নহেন। দশরথের মৃগয়ায় মুনিপুত্রবধ ব্যাপারকে তিনি বড় প্রাধান্যই দেন নাই। যেখানে বা তাঁহার করুণারস উদ্বেলিত হইয়া উঠে সেখানেও সৌন্দর্য্যের পর সৌন্দর্য্য চিত্রবিন্যস্ত। শোকের মধ্যেও তিনি রূপ এবং যৌবন, বিলাস এবং বিভ্রম চিত্রিত করেন, এবং এই রূপযৌবনবিভ্রমবিলাসের স্মৃতিতে তাঁহার দীর্ঘ বিলাপ রচিত হয়। প্রেয়সীর মৃতদেহ কোলে করিয়া অজ যেখানে বিলাপ করিতেছেন—ইন্দুমতীর চারু বিলাসগমন; নূপুরনিক্কণসহিত অশোক তরুতে মৃদু পাদতাড়ন; কোথাও অসমাপ্ত মালাগাঁথার কাহিনী; ললিত কলাবিদ্যায় তাঁহার নিপুণতার কথা; কোথাও একটি সুন্দর উপমা—এমন করিয়া বলা যে শুনিলেই মনে একটি চিত্র ফুটিয়া উঠে; কোথাও বা রূপসীর রূপের অতি মৃদু আভাস; —শ্লোকের পর শ্লোক কেবলি চিত্রবিন্যাস।

সমস্ত রঘুবংশটিই এইরূপ চিত্রপরম্পরা। হৃদয়াবেগ অপেক্ষা চিত্রসৌন্দর্য্যই কালিদাসের কাব্যে সমধিক অভিব্যক্ত। এবং ঘটনা যৎসামান্য অবলম্বনে বর্ণনা বিচিত্র। রাম যখন সীতাকে লইয়া লঙ্কা হইতে ফিরিয়া আসিতেছেন ঘটনা কিছুই নাই—কেবল আকাশপথে একখানি রথ চলিয়াছে এবং সেই রথে বসিয়া অযোধ্যার রাজদম্পতি। কিন্তু পথ দীর্ঘ এবং সমুদ্র নদনদী পাহাড় পর্ব্বতে দৃশ্য বিচিত্র। সুতরাং চিত্ররচনার এই অবসর। প্রথমেই সমুদ্রবর্ণনা—কতকগুলি চিত্র—কোথাও সেতুবন্ধে ফেনিল অম্বুরাশি আছাড়িয়া পড়িতেছে, কোথাও আকাশে সাগরে মিশাইয়া গিয়া এক অনন্ত বিস্তার, কোথাও তমালতালীবনরাজিনীলা দূর বেলাভূমি, কোথাও বা গুটিকতক পৌরাণিক স্মৃতি—বিস্মৃত নগরকাহিনী, পুরাতন মন্থনকথা—এবং

ইহারই মধ্যে যেখানে অবসর ঘটিয়াছে সুবিধামত একটু আধটু অধরপানের প্রসঙ্গ। ক্রমে বেলাভূমি অতিক্রম করিয়া রথ জনস্থানের উপর দিয়া যাইতে লাগিল। রামচন্দ্র সীতাকে দেখাইতেছেন;—এই সেই স্থান, তোমাকে অন্বেষণ করিতে করিতে যেখানে আসিয়া তোমার চরণারবিন্দবিশ্লেষদুঃখে বদ্ধমৌন একটি নূপুর কুড়াইয়া পাই; এই পর্ব্বতশৃঙ্গে একদিন—মনে পড়ে কি?—গুরু গুরু মেঘগর্জ্জনে পতির গাঢ় আলিঙ্গনমধ্যে মুদিতনয়নে আপনাকে লুকাইয়াছিলে; আর ঐ অম্বরলেখি গিরিশৃঙ্গে একদিন বর্ষা ঘনাইয়া আসিয়াছিল, কেকাধ্বনিতে, কদম্বসৌরভে চারিদিক আকুলিত হইয়া উঠিয়াছিল, তোমার বিরহে সেদিন আমার জীবন অসহ্য বোধ হইয়াছিল; এই পম্পাসরোবরে—অহো!—তুমি তখন নিকটে ছিলে না, আমি নির্নিমেষনেত্রে শুধু ঐ চক্রবাকমিথুনের নীরব প্রেমালাপ দেখিতাম; সাশ্রুনয়নে এইখানে একদিন স্তবকাভিনম্র অশোকলতাকে দেখিয়া পীনপয়োধরা জনকতনয়া ভ্রমে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হই—ভাগ্যে লক্ষ্মণ ছিল, সেই ভুল ভাঙ্গিয়া দিল; দূরে ঐ পঞ্চাপ্সর বিহারবারি—সমাধিভীত ইন্দ্র একজন তপস্বীকে এইখানে অপ্সরাগণের যৌবনকূটবন্ধে আবদ্ধ করেন; আর এই সেই সুতীক্ষাশ্রম—সুতীক্ষ্ণের নিকট সুরাঙ্গনাদিগের বিভ্রমচেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছিল, সহাসপ্রেক্ষিতদৃষ্টি এবং ব্যাজার্দ্ধসংদর্শিতমেখলা উভয়ই সফল হয় নাই; ঐ সরযূ দেখা যায়—তরঙ্গহস্তদ্বারা আমাকে আলিঙ্গন জানাইতেছে। রথ আসিয়া থামিল। রামচন্দ্র রথ হইতে অবতরণ করিলেন।

এতদিনে অযোধ্যার শ্রী ফিরিল। প্রাসাদসকল হইতে কালাগুরুধূম নির্গত হইতেছে—যেন রামচন্দ্র প্রবাস হইতে ফিরিয়া

আসিয়া স্বহস্তে পুরীর বেণী মোচন করিয়া দিয়াছেন। রাম একদিন প্রাসাদশিখরে উঠিয়া অযোধ্যাপুরীর দিকে চাহিয়া দেখিলেন—বিলাসী বিলাসিনীরা প্রমোদ-উদ্যানে বিহার করিতেছে এবং সরযূ পণ্যবাহিনী তরণীপরিপূর্ণা।

অগ্নিবর্ণের রাজত্বকালে এই বিলাস পূর্ণমাত্রায় উন্মুক্ত। রাজা বিলাসিনীপরিবৃত হইয়া অষ্টপ্রহর অন্তঃপুরেই থাকেন; প্রজারা তাঁহার দর্শন পায় না; রাজকার্য্য মন্ত্রীবর্গ সুসম্পন্ন করেন। অন্তঃপুরে নিত্য মন্মথোৎসব। রাজা কামিনীগণের সহিত জলবিহার করেন—জলে বিলাসিনীদিগের নয়নাঞ্জন ও অধরের কৃত্রিম রাগ ধুইয়া যায় এবং স্বাভাবিক মুখরাগ অগ্নিবর্ণকে অধিকতর প্রলোভিত করে। বিলাসিনীদিগের সহিত মনোরম পানভূমিতে বসিয়া তিনি বকুলের সুরা পান করিতে থাকেন এবং প্রমদাগণপ্রদত্ত মুখাসবপানে একান্ত বিহ্বল হইয়া পড়েন। রাজার এক অঙ্কে বীণা, অপর অঙ্কে অঙ্গনা, এবং সম্মুখে অবিশ্রাম নর্ত্তকীর লাস্যলীলা। প্রমদা হইতে প্রমদান্তরে, বিলাস হইতে বিলাসান্তরে অগ্নিবর্ণ নিত্য রমণ করেন। বিপুল অন্তঃপুরেও কুলাইয়া উঠে না। লতাকুঞ্জে পুষ্পশয্যা রচনা করিয়া পরিজনাঙ্গনাগণের সহিত প্রমোদালাপে কালক্ষেপ করিতে যান। বাদ্‌শাহী বিলাসিতাও এখানে হার মানে। এবং এই উৎকট উন্মাদনা রাজযক্ষ্মাকারে ব্যক্ত হইয়া অল্পদিনমধ্যেই অগ্নিবর্ণকে ইহলোকের গ্রাস হইতে ছিনাইয়া লয়।

এইখানেই রঘুবংশের উপসংহার—এই বাদ্‌শাহী বিলাসের এক-সর্গ চিত্রপরম্পরায়। সুতরাং রঘুবংশ সম্বন্ধে আমাদের আর জানিবার বড় কিছু রহিল না। এবং এই ঊনবিংশ সর্গের মহাকাব্য হইতেই বোধ করি কালিদাসের চিত্রাঙ্কনী প্রতিভার যথেষ্ট পরিচয় পাইলাম।

কিন্তু ইহাই চরম নহে। কালিদাসের অন্য কাব্য আলোচনা করিলেও তাঁহার এই বিশেষত্ব দৃষ্টিগোচর হয়। মেঘদূতের মত অমন সামান্য অবলম্বনের উপর নির্ভর করিয়া কেবল কাল্পনিক কথা লইয়া এমন একখানা সমগ্র কাব্য কালিদাসের পূর্ব্বে সংস্কৃত সাহিত্যে দেখা যায় না। কিন্তু কালিদাসের চিত্রপ্রিয় কবিপ্রকৃতি কেবল ছবি আঁকিবার জন্য আপন মনের মত বিষয়টি বাছিয়া লইয়াছে। যক্ষের বিরহবর্ণনা উপলক্ষ্য মাত্র।—

মেঘদূত পৃথিবীর সাহিত্যে অদ্বিতীয় কেবল এই চিত্রপরম্পরায়। কুবেরানুচরের দীর্ঘ পথ বর্ষা, বিরহ এবং অভিসারের মায়ারচনা। প্রতি বিরহিণীর দুঃখবর্ণনায় যক্ষ আপন প্রেয়সীর বিরহবিধুরমূর্ত্তি আঁকিয়া বাঁচে, প্রবাসীর কথায় মেঘের নিকট আপন হৃদয় খুলিয়া দেখায়। অলকার প্রমোদবিলাস বর্ণনা করে—প্রতিযোগিতায় তাহার বিরহ যেন সমধিক ফুটিয়া উঠে। কিন্তু কেবলি চিত্র—ছবির পর ছবি।

এইরূপ চিত্র আঁকিতেই কালিদাস কিছু ভালবাসেন। বজ্রবিদ্যুতের মধ্যে সূচিভেদ্য অন্ধকারে লঘুগতি অভিসারিকা; মুক্ত বাতায়নে বসিয়া একবেণী বিরহিণী—উৎসঙ্গে বীণা পড়িয়া রহিয়াছে, মুখের গান মুখেই রহিয়া গিয়াছে, এবং চারিদিক হইতে শুধু মেঘমন্দ্রস্বরে শ্রাবণ ঘনাইয়া আসিতেছে; প্রবাসী রামগিরিশিখরে দাঁড়াইয়া মেঘের পানে চাহিয়া—মেঘ যদি দৌত্যকার্য্য করে!

কুমারসম্ভবও কতকগুলি ছবি। প্রথমে হিমালয়ে বালিকা গৌরী। দ্বিতীয়তঃ শিবের তপোবনে যুবতী গৌরী। তৃতীয়তঃ গৌরীর তপোবনে বৃদ্ধ শিব। চতুর্থতঃ শিবের বিবাহ।

রতিবিলাপেও করুণরসে কালিদাসের হৃদয়াবেগ উচ্ছ্বসিত

হইয়া উঠে নাই—তাহা নৈপুণ্যপরিপূর্ণ, কেবল মাঝে মাঝে এক একটি চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। প্রথমেই কালিদাস রতিকে এক কথায় আঁকিয়া তুলিলেন—রতি বসুধালিঙ্গনধূসরস্তনী। রতির আর বাঁচিবার সাধ নাই—স্বামীর অনুগমন ভিন্ন তাহার জ্বালা জুড়াইবে না। সেই রতি বিলাপ করিতেছেন,

রজনী তিমিরাবগুণ্ঠিতে
পুরমার্গে ঘনশব্দবিক্লবাঃ।
বসতিং প্রিয় কামিনাং প্রিয়াঃ
ত্বদৃতে প্রাপয়িতুং ক ঈশ্বরঃ॥
নয়নাস্তরুণানি ঘূর্ণয়ন্
বচনানি স্খলয়ন্ পদে পদে।
অসতি ত্বয়ি বারুণীমদঃ
প্রমদানামধুনা বিড়ম্বনা॥ ইত্যাদি।

পরে পরে কতকগুলি ছবি—ঘন-অন্ধকার রাজপথে ঘনগর্জ্জন-ভীতা একাকিনী অভিসারিকা, বারুণীমদ্যপানে অরুণনয়না স্খলিত-বচনা প্রমদাজন, তাহার পর জ্যোৎস্না কোকিল মলয় যে যেখানে আছে, এবং মদনাভাবে এই সকলের নিষ্ফলতা;—অতএব, হে মদন, তুমি ফিরিয়া আসিয়া ইহাদের গতি কর।

এ পর্য্যন্ত কালিদাসের প্রতিভার যে বিশেষত্ব দেখা গেল শকুন্তলায় ইহার পূর্ণবিকাশ। বহিঃপ্রকৃতিতে চিত্রকরের মানসী প্রতিমা এইখানে যেন সম্পূর্ণরূপে আপনাকে মুদ্রিত করিয়া দিয়াছে। সেইজন্য চিত্রগুলি এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর এবং সম্পূর্ণ।

প্রথমেই রথযাত্রা। রাজা দুষ্মন্ত রথারোহণে দ্রুতগামী কৃষ্ণসারের অনুসরণ করিয়াছেন, মৃগ প্রাণভয়ে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া চলিয়াছে এবং মনোহর গ্রীবাভঙ্গ সহকারে মুহুর্মুহু পশ্চাদ্দিকে ফিরিয়া দেখিতেছে। রথের গতিবেগ এত দ্রুত যে,

যদালোকে সূক্ষ্মং ব্রজতি সহসা তদ্বিপুলতাং
যদন্তর্বিচ্ছিন্নং ভবতি কৃতসন্ধানমিব তৎ।
প্রকৃত্যা যদ্ বক্রং তদপি সমরেখং নয়নয়ো-
র্ন মে পার্শ্বে কিঞ্চিৎ ক্ষণমপি ন দূরে রথজবাৎ॥

ইহা নাট্যকলার বিরোধী। কারণ, অতিক্রুত রথযাত্রা এবং তদবস্থায় রাজা ও সারথীর কথোপকথন দৃশ্যকাব্যে স্থান পাইবার যোগ্য নহে। কিন্তু কেমন ছবি!

তাহার পর তপোবনবর্ণনা। ক্রমে, আলবালে ঋষিকন্যাদের জলসেচন এবং রাজার গোপনে তাহাদের কথাবার্ত্তা শ্রবণ; শকুন্তলার নিবিষ্টচিত্তে রাজার ধ্যান ও দুর্ব্বাসার অভিশাপ; শকুন্তলার বিদায়; রাজসভার দৃশ্য; অঙ্গুরীয়কপ্রাপ্ত রাজার উৎকণ্ঠা ও দূরে মহিষীর গান; সিংহশিশুর সহিত বালকের খেলা ও শিশুচিত্র।

এইগুলি এক একখানি ছবি নহে—ইহারই এক একখানি অনেকগুলি ছবির সমষ্টি। শকুন্তলা নাটকের বিশেষত্ব এই যে, তাহার প্রতি খুঁটিনাটি ঘটনা এবং কথাবার্ত্তা পর্য্যন্ত যেন তুলি দিয়া আঁকা যায়। চিত্রকর যেমন রূপসীকে নানা অবস্থার মধ্যে ফেলিয়া এবং নানা ভঙ্গীতে আঁকিয়া তাহার সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলেন, কালিদাস সেইরূপ বিচিত্র দৃশ্যে এবং বিবিধ ভাব ও ভঙ্গীতে যতরকমে সম্ভব শকুন্তলার সৌন্দর্য্য উদ্‌ঘাটন করিয়া দেখাইয়াছেন। কোথাও বা কুরবকশাখায় বঙ্কল আটকিয়া যায়, কোথাও বা প্রিয়সখী বঙ্কলের দৃঢ়বন্ধন শিথিল করিয়া দেয়, কোথাও অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে সুন্দরীর কচি কিসলয়বৎ রূপলাবণ্য ফুটিয়া পড়ে; সৌন্দর্য্যের কবি সৌন্দর্য্য ফুটাইতে ব্যাকুল—একটি বাহুভঙ্গী, একটি হৃদ্‌স্পন্দন, পাণ্ডু মুখ-

কমলে অতি ক্ষীণ মৃদু অরুণিমাসঞ্চার এবং স্নিগ্ধ দৃষ্টির নিবিড় চাঞ্চল্যটুকু পর্য্যন্ত তাঁহার দৃষ্টি অতিক্রম করে না। যেখানে অলৌকিক ঘটনার অবতারণা করিয়াছেন—যেমন স্ত্রীসংস্থানং জ্যোতিঃ আসিয়া শকুন্তলাকে লইয়া যাওয়া—সেখানেও কেবল একটি সুন্দর চিত্র ব্যক্ত হইয়াছে।

শকুন্তলা যদিও নাটক এবং উহার মধ্যে প্রকৃতিতত্ত্ব সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি নানাবিধ তত্ত্ব থাকিতে পারে তথাপি শকুন্তলা আমাদের মনে প্রধানতঃ কতকগুলি চিত্রশ্রেণী টাঙ্গাইয়া দিয়া যায়। আমরা যে শকুন্তলার ঘটনাপ্রবাহে ভাসিয়া যাই তাহা নহে, বরঞ্চ উহার স্থির মুহূর্ত্তগুলিই আমাদিগকে আকর্ষণ করিয়া রাখে—নাটকটি অগ্রসর হইতে হইতে যে যে স্থানে ছবি-আকারে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছে সেই সেই স্থানই আমাদের চোখে জাজ্বল্যমান হইয়া উঠে।

যেমন, বিদায়দৃশ্য। শকুন্তলা অগ্রসর হইতে যান, পশ্চাৎ হইতে কে যেন টানিয়া রাখে, ফিরিয়া দেখেন তাঁহারই স্নেহপালিত মৃগশিশু অঞ্চল ধরিয়া টানিতেছে। প্রত্যেক তরু এবং লতা শকুন্তলার সুখদুঃখের সঙ্গী—বারবার তাহাদের কাছে দাঁড়াইয়া, তাহাদিগকে স্পর্শ করিয়া, আলিঙ্গন করিয়া শকুন্তলা তপোবনের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতেছেন।

রাজসভামধ্যে দুষ্মন্ত যখন প্রত্যাখ্যান করিলেন, তখনও ঘটনা অধিক নয় এবং শকুন্তলা কথাও বড় বলেন নাই, কেবল সেই সভামধ্যে দুষ্মন্তকে 'পৌরব' সম্ভাষণ করিয়া যখন দাঁড়াইলেন, তখনই দুষ্মন্ত, রাজসভা, শার্ঙ্গরব শারদ্বত এবং এই দুই তপস্বীর মধ্যস্থলে দণ্ডায়মানা তেজস্বিনী তপোবনবালিকার একখানি উজ্জ্বল চিত্র ফুটিয়া উঠিল।

কেবলমাত্র "অয়মহং ভোঃ" এইটুকুতে শকুন্তলার বিরহ চিত্রিত হইয়াছে। দুর্ব্বাসা এই বলিয়া আশ্রমের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন—কিন্তু তবু শকুন্তলা মাথা তুলিলেন না, তাঁহার মুখে কথা নাই।

এইরূপ ঘুরিয়া ফিরিয়া একটি রূপসীর চিত্র খাড়া করিয়া তুলিতে পারিলে কালিদাসের স্ফূর্ত্তি ধরে না। সুখে দুঃখে বেদনা বিলাসে স্ত্রীজাতির প্রতি তাঁহার যেন কিছু সস্নেহ সহৃদয়তা দেখা যায় এবং স্ত্রীসঙ্গে তিনি একটু বিশেষ আনন্দ লাভ করেন।

নারী এবং প্রকৃতিসৌন্দর্য্যের প্রতি এমন নিবিড় প্রেম অন্য কোন কবিতে দেখা যায় না। যেখানে তপোবনের মধ্যে ঋষি-বালিকার সমাবেশ করিয়াছেন সেখানে এই তাঁহার সেই দুই অনুরাগের একত্র মিলন হইয়াছে। নগরবাসী রাজা তপোবনের পালিত মৃগসেবিত তরুকুঞ্জের মধ্যে একটি ঋষিকুমারীর, একটি অনাঘ্রাত পুষ্পের সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া যে একটি নাট্যব্যাপার ঘটাইয়া তুলিয়াছেন তাহা যেন কবির নিজের কামনাস্বপ্ন। আত্মপ্রকৃতির সমগ্র অনুরাগ সেচন করিতে পারেন কালিদাস এমন একটি বিষয় সৃজন করিয়া লইয়াছেন, এই জন্য সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্যে শকুন্তলা এমন একটি অপূর্ব্ব সৃষ্টি হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

কিন্তু কেবল চিত্ররচনা নহে, খণ্ড খণ্ড চিত্ররচনাতেই কালি-দাসের প্রতিভার বিশেষ পটুত্ব। পাঠকেরা তাহার পরিচয় পাইয়া-ছেন। পথের বর্ণনা করিতে কালিদাস বড় ভালবাসেন। তাহার কারণ পথের দুইপার্শ্বে খণ্ড খণ্ড চিত্র পরে পরে চক্ষের সমক্ষে উপনীত হয়; একটার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাহার পরেই আর একটার প্রতি চক্ষু পড়ে। একটা সমগ্র সম্পূর্ণ বৃহৎ চিত্র রচনা করিতে হয় না। সমস্ত রঘুবংশ যেন ইক্ষ্বাকুবংশের একটী দীর্ঘ

প্রাচীন রাজপথ। কবি রথে চড়িয়া বর্ণনা করিতে করিতে চলিয়াছেন। দিলীপের প্রথম চিত্র রথযাত্রা। রঘুর দিগ্বিজয়ও এই ভাবের; দেশ হইতে দেশান্তরে, দৃশ্য হইতে দৃশ্যান্তরে গমন। ইন্দুমতীর স্বয়ম্বরসভাতেও কবির প্রতিভা দুইপার্শ্বের শ্রেণীবদ্ধ রাজগণকে অবলম্বন করিয়া এক একটি দৃশ্যকে পরে পরে স্পর্শ করিয়া গিয়াছে। রামের রথযাত্রাতেও কবিপ্রতিভার সেই গতি-লীলা প্রকাশ পায়। অগ্নিবর্ণের বিলাসসম্ভোগও সেইরূপ। প্রমোদ হইতে প্রমোদান্তরে অপরিতৃপ্ত চপল হৃদয়ের ভ্রমণ-চাঞ্চল্য। মেঘদূত কাব্যও মেঘচ্ছায়াস্নিগ্ধ দুইপার্শ্বের ছবি তুলিতে তুলিতে ভ্রমণ। ঋতুসংহার সম্বন্ধেও এ কথা খাটে। অমনতর নিতান্তই বর্ণনাকাব্য সংস্কৃত সাহিত্যে বিরল। ঠিক পথবর্ণনা নহে বটে—কিন্তু ইহাও চলিতে চলিতে বর্ণনা। বিক্রমোর্ব্বশী যদিও নাটক, কিন্তু কবি নাট্যরীতি পরিহার করিয়া নায়ককে অরণ্যে অরণ্যে বিলাপপূর্ব্বক ভ্রমণ করাইয়াছেন। কখনো পাখী, কখনো মেঘ, কখনো লতা, কখনো পর্ব্বতের প্রতি খণ্ড খণ্ড উচ্ছ্বাস।

এইরূপ খণ্ড খণ্ড চিত্র এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারুকৌশলের প্রতি কবির বিশেষ দৃষ্টি থাকাতে অনেক সময় বৃহৎ চিত্ররচনায় তিনি সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। সমুদ্র পর্ব্বতের ন্যায় প্রকৃতির বিরাট দৃশ্যে কবি যদি এক মুহূর্ত্তে দৃশ্যের সমস্ত বৃহত্ত্ব চক্ষের সমক্ষে খাড়া করিয়া না তুলিতে পারেন তবে যে চিত্রই ব্যর্থ হয়। কারণ, বিরাটত্বই তাহার প্রধান ভাব; তাহার খণ্ড খণ্ড আংশিক খুঁটিনাটিকে প্রাধান্য দিলে তাহার প্রকৃত ভাবটা-কেই খর্ব্ব করা হয়। পর্ব্বতে যে চমরী লাফাইতেছে বা ওষধি জ্বলিতেছে বা গজমুক্তা পড়িয়া রহিয়াছে তাহা চিত্রিতব্য বিষয়

নহে—কারণ বৃহৎ হিমালয়ের মধ্যে তাহারা কে কোথায় বিলীন হইয়া থাকে, তাহা চিত্রকরের দৃষ্টিগোচর হওয়াই উচিত নহে। কিন্তু কালিদাস নিপুণ চিত্রকর হইয়াও তাঁহার অতি নৈপুণ্যবশতই হিমালয় ও সমুদ্র বর্ণনায় অকৃতকার্য্য হইয়াছেন। তিনি প্রত্যেক অংশের স্বতন্ত্র বর্ণনার লোভ সম্বরণ করিতে পারেন না। ভবভূতি যেখানে একটিমাত্র মেঘমন্দ্রসমাসে বিন্ধ্যপর্ব্বতের অন্ধকার অরণ্য সম্মুখে মূর্ত্তিমান্ করিয়া তুলেন কালিদাস সেখানে প্রত্যেক লতার এবং ফুলের স্বতন্ত্র আস্বাদটুকু ছাড়িতে পারেন না।

বুদ্ধচরিত।

যদি বৌদ্ধধর্ম্ম কেবল ভারতবর্ষের মধ্যে নিবদ্ধ থাকিত এবং বৌদ্ধেরা হিন্দুদিগের ন্যায় পৃথিবীর অন্যান্য জাতিসমূহকে ম্লেচ্ছ বলিয়া ঘৃণা করিত তাহা হইলে আজ পৃথিবীতে সেই প্রকাণ্ড ধর্ম্মের নামগন্ধ পর্য্যন্ত থাকিত না এবং বৌদ্ধেরা যে কি প্রকার জীব ছিল তাহার পরিচয় আমরা কোন স্থানে বা কোন পুস্তকে পাইতাম না। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে শাক্যের ধর্ম্ম মানবধর্ম্ম হইয়া অবতীর্ণ হয়। ইহার জন্ম ভারতে হয় বটে; কিন্তু ইহা জাতিনির্ব্বিশেষে সকল লোককে পরিত্রাণ দিবার জন্য সৃষ্ট হয়। সেই জন্য ভারত হইতে বহির্ভূত হইলেও আজ সেই ধর্ম্মের তত্ত্ব আমরা নানা দিক হইতে পাইতেছি। শুদ্ধ এদেশে প্রচারিত হইলে আমরা এধর্ম্ম যে কোনকালে জীবিত ছিল, তাহা জানিতে পারিতাম না। কিন্তু শাক্য বর্ত্তমান থাকিতে থাকিতেই তাঁহার ধর্ম্ম ম্লেচ্ছদিগের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিয়াছিল এবং অশো-

কের রাজত্বকালে তাহা এসিয়া, ইউরোপ এবং আফ্রিকা মহাখণ্ড পর্য্যন্ত প্রচারিত হইয়াছিল। সুতরাং ভারত হইতে লুপ্ত হইয়া গেলেও আমরা বৌদ্ধধর্ম্মের সমুদয় বৃত্তান্তই অন্য দেশ হইতে প্রাপ্ত হই।

এই ধর্ম্ম যে কিপ্রকারে এদেশ হইতে নির্ম্মূল হইয়া যায় তাহার বৃত্তান্ত জানিতে ইচ্ছা যায় বটে, কিন্তু সে বৃত্তান্ত ঘোর অন্ধকারে আবৃত। হিন্দুরা সে ধর্ম্মের চিহ্নমাত্র রাখে নাই। তবে ইতিহাস এবং সাহিত্য পাঠ করিয়া আমরা দুই একটা স্থূল কারণ অনুমান করিয়া লইতে পারি। প্রথমতঃ কালক্রমে বৌদ্ধধর্ম্ম শিথিল এবং কুসংস্কারাপন্ন হইয়াছিল। হিন্দুদিগের যত তন্ত্রমন্ত্রের বিষয় আমরা পাঠ করি সে সমুদয় বৌদ্ধধর্ম্মকেও গ্রাস করিয়াছিল। অবশেষে এমন হইয়া পড়িয়াছিল যে, হিন্দুধর্ম্মের কুসংস্কার এবং বৌদ্ধধর্ম্মের কুসংস্কার এ দুয়ের মধ্যে কোন প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যাইত না। সুতরাং সেই পূর্ব্বকার তেজ বল ও বিশ্বাস বৌদ্ধদিগকে একেবারে পরিত্যাগ করিয়া যায়। এদিকে হিন্দুদিগের পৌরাণিক ভক্তি এবং একেশ্বরতত্ত্ব দিন দিন গাঢ় এবং বলবান্ হইতে লাগিল। শাক্যের ধর্ম্ম এক হিসাবে নিরীশ্বর ছিল। সুতরাং তাহাতে যখন কুসংস্কার আসিয়া পড়িল তখন তাহার মধ্যে যাহা কিছু সার ছিল তাহাও লোপ পাইয়া গেল। লোকে বলিতে লাগিল যে যদি অনৈসর্গিক ঘটনাকে বিশ্বাস করিতে হইল এবং তান্ত্রিক ভোজবাজিকে সম্ভব বলিয়া বোধ হইল, তাহা হইলে এই সকল ব্যাপার ভক্তিমূলক হইলেই মনকে তৃপ্ত করিতে পারে। আর নিরীশ্বর হইয়া সে সকলকে বিশ্বাস করিলে বিশ্বাসের বলও থাকে না এবং মুক্তির কোন উপায়ও থাকে না। এই জন্য প্রকৃতির নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়াই যেন

মন স্বভাবতঃ ভক্তির দিকে দৌড়াইয়া গেল। নিরীশ্বর ধর্ম্মের প্রতিবাদ করিতে করিতে পুরাণাদির পরাক্রম বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এধর্ম্মে যদি ঈশ্বরতত্ত্ব থাকিত তাহা হইলে বোধ হয় এখনও তাহার প্রাদুর্ভাব এ দেশে থাকিত। কিন্তু ঈশ্বরবাদ না থাকাতে ইহা ভক্তির প্রচণ্ড স্রোতের মুখে দাঁড়াইতে পারে নাই।

ধর্ম্মপতনের দ্বিতীয় কারণ অদ্বৈতবাদের প্রাদুর্ভাব। শঙ্করাচার্য্যের যুক্তির প্রচণ্ড উত্তাপে বৌদ্ধ তেজের হ্রাস হয়। সেই সময় পণ্ডিতে পণ্ডিতে তর্ক উপস্থিত হইলে বৌদ্ধ আচার্য্যকেই পরাস্ত হইয়া মস্তক দান করিতে হইত। তৃতীয় কারণ রাজাদিগের আক্রোশ। মগধ দেশের রাজারা শেষ পর্য্যন্ত বৌদ্ধ ছিলেন। কিন্তু অন্যান্য সমুদয় প্রদেশেই হিন্দুধর্ম্মের আধিপত্য ক্রমশঃ স্থাপিত হইয়াছিল। কেবল তাহা নহে। হিন্দু রাজারা যুদ্ধ করিয়া স্বাধীন রাজ্য সংস্থাপন করিতে লাগিলেন এবং যেখানে বৌদ্ধ বিহার ছিল সেইখানে সেই বিহার নষ্ট করিয়া তাহার পরিবর্ত্তে শিবের মন্দির স্থাপন করিতেন। কাশীতে যত মন্দির এখন বর্ত্তমান আছে তাহার কোনটাই বোধ হয় অধিক পুরাতন নহে। প্রায় সকলই বৌদ্ধধর্ম্মের পরে স্থাপিত। ইহাও বলা যাইতে পারে যে যত বৌদ্ধ বিহার ছিল তাহাদিগের প্রস্তর ও ইষ্টক লইয়াই এখনকার মন্দির সকল নির্ম্মিত। কাশীতে এখনও একটি বাজার আছে তাহার প্রত্যেক ইষ্টক ও প্রস্তরখণ্ড বোধ হয় সরনাথ হইতে প্রাপ্ত। চতুর্থ কারণ মুসলমানদিগের দেশ অধিকার। যখন মুসলমানেরা এদেশ জয় করে, তখনও বৌদ্ধধর্ম্ম কাশী এবং মগধ প্রদেশে জীবিত ছিল। তাহাদিগের আগমনে বৌদ্ধ কীর্ত্তি যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল তাহা একেবারে

ভূমিসাৎ হইয়া যায়। বিহার সকল একে একে মস্‌জিদে পরিণত হইতে লাগিল এবং এতদ্ব্যতীত যত প্রতিমূর্ত্তি ছিল তাহা পুত্তলি বলিয়া এককালে ভাঙ্গিয়া ফেলা হইল। সেই সময় হইতেই ভারতবর্ষের গৌরবের অন্তর্দ্ধান হয়।

হিন্দুদিগের সহিত বৌদ্ধদিগের ঘোরতর তর্ক-যুদ্ধ হইয়া যখন বৌদ্ধেরা পরাস্ত হয়, তখন বিজিত দলের সঞ্চিত যত পুস্তক ছিল তাহার অধিকাংশ নেপাল প্রদেশে নিরাপদ লাভ করিয়াছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে এই ধর্ম্ম চীন তিব্বৎ জাপান ব্রহ্ম এবং সিংহল দেশে আশ্রয় পায় এবং বৌদ্ধশাস্ত্র সমুদয় সেই সেই দেশের ভাষায় অনুবাদিত হয়। আজ সেই অনুবাদিত পুস্তকগুলি ফরাসী জর্ম্মণ এবং ইংরাজী ভাষায় অনুবাদিত হইতেছে। আমরা এই সকল পাঠ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম এবং বৌদ্ধসমাজের সমুদয় মূলতত্ত্ব অবগত হইতে পারিয়াছি। ললিতবিস্তর বলিয়া যে বুদ্ধের জীবনী সংস্কৃতে রচিত হইয়াছিল তাহা তিব্বৎ এবং ব্রহ্মদেশে অনুবাদিত হয় এবং বিনয়শাস্ত্র সিংহল দেশে পালি ভাষায় সুন্দররূপ জীবিত আছে। কিন্তু আশ্চর্য্য! যে দেশে বুদ্ধের জন্ম, যেখানে তাঁহার ধর্ম্ম সহস্রবর্ষাধিক রাজত্ব করে সেখানে বৌদ্ধ সমাজের চিহ্নমাত্র নাই! কিন্তু সিংহল তিব্বৎ প্রভৃতি দেশে যে সকল পুস্তক আছে তাহা হইতে আমরা সেই সমাজের সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইতেছি। শাক্য দেখিতে কি-প্রকার লোক ছিলেন, তাঁহার মস্তকের কেশবিন্যাস কিপ্রকার ছিল, তাঁহার ভ্রূদ্বয় কুঞ্চিত কিম্বা ঈষৎ আলম্বিত ছিল, তাঁহার অঙ্গুলির নখগুলি তাম্রবর্ণ কিম্বা শুভ্রবর্ণ, তিনি বিশ্বাসীদিগের গৃহে কি খাইতেন, তাঁহার বস্ত্র কি বর্ণের ছিল—এতদ্ব্যতীত তাঁহার জীবনের অতিশয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কথা পর্য্যন্ত আমরা কল্পনা

করিয়া লইতে পারি। আবার তাঁহার শিষ্যেরা কিপ্রকার খাদ্য আহার করিত, কি প্রণালীতে এবং পাত্রে উচ্ছিষ্ট না রাখিয়া অঙ্গুলি লেহন না করিয়া কিরূপ নিঃশব্দে আহার করিত, কিরূপ ঘরে শয়ন করিত, কি ভাবে পূজা করিত, কি মন্ত্র পাঠ করিত, পরস্পরকে কি ভাষায় সম্বোধন করিত, গুরুকে কেমন করিয়া সম্ভাষণ করিত, তাহাদিগের বিহার সকল কিরূপে নির্ম্মিত, এ সকলই যেন আমাদিগের চক্ষের সম্মুখে অঙ্কিত আছে।

একজন প্রসিদ্ধ কবি বলিয়া গিয়াছেন যে, পরমেশ্বরের কার্য্য-গুলি বৃক্ষস্বরূপ। কিন্তু পৃথিবীর বৃক্ষের সহিত তাহাদিগের এই প্রভেদ যে, তাহাদিগের মূল জলে থাকে এবং শাখা প্রশাখা সকল জগন্মণ্ডলকে ছায়া দান করে। বাস্তবিক ধর্ম্মবৃক্ষের মূল স্বর্গে। তাহা যদি না হইত তাহা হইলে ইহা কি কখন সম্ভব হইত যে, হিন্দুরা বৌদ্ধধর্ম্মের শাখা প্রশাখা সকলই কাটিয়া ফেলিয়াছে অথচ সেই বৃক্ষ আজ নব শাখা বিস্তার করিয়া অন্য সকল দেশের লোককে ছায়া দান করিতেছে! মূলে দৈব তেজ না থাকিলে আবার সেই ধর্ম্ম পুনরায় অঙ্কুরিত হইতে পারিত না।

এই ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক একজন মহাপুরুষ ছিলেন। তাঁহার জীবন আলোচনা করিলে যেমন নানাপ্রকার উপকার লাভ করা যায় তেমনি আবার স্বদেশানুরাগ বাড়াইয়া দেয়। ভারত যখন জাগ্রত হইয়া উঠে, তখন কি ভাবে জাগ্রত হয় তাহা আমরা বুদ্ধের জীবনচরিত পাঠ করিলে জানিতে পারি। ভারতের হুঙ্কার-রবে পৃথিবী জাগ্রত হইয়া উঠে এবং সেই শব্দ শুনিয়া মানবজাতির সুষুপ্ত অবস্থা দূর হইয়া যায় এবং নূতন সত্য, নূতন রস, নূতন ভাব এবং বিশ্বাস আসিয়া পৃথিবীকে উন্নতির দিকে অগ্রসর করে। আমরা সেই বুদ্ধদেবের জীবন বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

প্রথম অধ্যায়।

শাক্যজাতি এবং কপিলবস্তু।

বুদ্ধের অনেকগুলি নাম ছিল। নামকরণের সময় তাঁহার নাম সিদ্ধার্থ হয়। লোকে তাঁহাকে শাক্যগৌতম কিম্বা শাক্যসিংহ বলিয়া ডাকিত। তিনি সাধনে সিদ্ধ হইলে পর শাক্যমুনি এবং শাক্যবুদ্ধ নাম প্রাপ্ত হন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহাকে তথাগত এবং সুগত বলিয়াও ডাকিত। শাক্যগৌতম তাঁহার জাতীয় নাম ছিল। ইহার অর্থ এই যে, তিনি শাক্যজাতির লোক ছিলেন এবং তাঁহার গৌতমগোত্রে জন্ম। শাক্য কিম্বা শক কিম্বা শাকী এইরূপ নামের এক বা ততোধিক জাতির কথা আমরা মহাভারত এবং গ্রীক পুস্তকেও পাঠ করিয়া থাকি। এই তিনটি এক বা স্বতন্ত্র জাতি ইহা জানিবার কোন উপায় নাই। তবে শাক্যদিগের কতকগুলি আচার ব্যবহারের বিষয় পড়িলে বোধ হয়, যে তাহারা ভারতের বহির্ভূত কোন দেশ হইতে আসিয়া এদেশে উপনিবেশ স্থাপন করে। আর যদি মহাভারতে উল্লিখিত শক জাতি শাক্য জাতি হয়, তাহা হইলে এপ্রকার জাতি অনেককাল হইতে এদেশে অবস্থিতি করিতেছে। সুতরাং তাহাদিগের উৎপত্তি নির্ণয় করিবার জন্য বিদেশে যাইবার প্রয়োজন নাই।

শাক্যেরা সূর্য্যবংশোদ্ভূত এবং তাহাদিগেরও পূর্ব্বপুরুষের নাম ইক্ষ্বাকু। এই জাতি অনেক দিন ধরিয়া সিন্ধুদেশে পটল নামক স্থানে রাজত্ব করিত। পরে তাহাদিগের মধ্যে একজন কাশীর অধিপতি হন। তাঁহার নাম অশ্ব। অশ্বের পাঁচজন মহিষী ছিল, যথা—হস্তা, চিত্রা, জন্তু, জালিনী এবং বিশাখা।

হন্তার চারি পুত্র এবং পাঁচ কন্যা ছিল। যখন হন্তার কাল হয়, তখন অশ্ব আর একটি দারপরিগ্রহ করেন। এই বিবাহে তাঁহার একটি সন্তান হয়। যখন এই সন্তান বয়ঃপ্রাপ্ত হয় তখন তাহার মাতা রাজাকে এই অঙ্গীকার করাইয়া লয়েন যে, তাঁহার সমুদয় রাজ্য এবং সম্পত্তির উত্তরাধিকারী সেই সন্তান হইবে। অশ্ব আর কিছু করিতে না পারিয়া তাঁহার চারি সন্তানকে ডাকাইয়া বলিলেন—"তোমাদিগের প্রাপ্য রাজ্য আমি আর একজনকে দিয়াছি। আমি এই কার্য্য স্ত্রীলোকের মোহে পড়িয়া করিয়াছি। তোমরা আর এখানে থাকিও না। তোমাদিগকে যথেষ্ট ধন জন দিতেছি—তাহা লইয়া তোমরা আর একটি নগর প্রতিষ্ঠা কর।" পুত্রেরা যাইবার উপক্রম করিতেছেন এমন সময় তাহাদিগের ভগিনীরা মনে করিল—আমরা বিমাতার কাছে থাকিয়া কি করিব?" সুতরাং তাহারাও ভ্রাতৃগণের সহগামিনী হইল।' ইহা দেখিয়া নগরের সম্রান্ত লোকেরাও ভাবিল—রাজপুত্রেরা নিশ্চয় এখানে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া রাজ্য পুনরাধিকার করিবে। আমরা সঙ্গে যাইলে ফিরিবার কালে যথেষ্ট অনুগ্রহ পাইব। তাহা হইলে আমরাও ইহাঁদিগের সমভিব্যাহারে যাই না কেন।

এইরূপে চারিজন রাজকুমার পাঁচ ভগ্নী এবং অসংখ্য অনুচর দ্বারা বেষ্টিত হইয়া কাশীর বাহিরে এক নিবিড় বনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেই বনের প্রান্তে এক হ্রদ ছিল এবং সেই হ্রদের একপার্শ্বে কপিলমুনির আশ্রম ছিল। তাঁহারা সেই মুনির আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কপিলমুনি তাঁহাদিগের ইতিহাস আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া বলিলেন—"তোমরা এইখানে থাকিয়াই একটি নগর স্থাপন কর। আমার ইচ্ছা যে, এই আশ্রম যে স্থানে নির্ম্মিত, ঠিক তাহারই উপর নবনগরের প্রতিষ্ঠা হয়। আমার ইচ্ছামত

কার্য্য করিলে তোমাদিগের রাজধানী জগদ্বিখ্যাত হইবে। দেখ, এই বনের পশুরা হিংস্রক হইয়াও হিংসা করে না। ব্যাঘ্র হরিণ এখানে কুশলে নিবাস করে। সুতরাং তোমরাও এখানে অবস্থিতি করিলে তোমাদিগের নগরও শান্তিপ্রিয় হইবে।” রাজকুমারেরা মহা উল্লাসের সহিত নগরনির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইলেন এবং শেষে নগর নির্ম্মিত হইলে তাহার নাম কপিলবস্তু রাখিলেন। তাঁহারাও কপিলের শিষ্য হইলেন।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, এই মুনি প্রসিদ্ধ সাংখ্যপ্রণেতা কপিল কি না? যদি একথা সত্য হয়, তাহা হইলে বৌদ্ধধর্ম্ম যে সাংখ্যদর্শনের অনুমোদিত একথা অক্লেশে গ্রহণ করা যাইতে পারে। যদি বুদ্ধের পূর্ব্বপুরুষেরা কপিলের শিষ্য ছিলেন বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তাহা হইলে সাংখ্যমত শাক্যজাতির রক্তস্রোত দিয়া চলিয়া আসিতেছে একথা অত্যুক্তি নহে। স্বভাবতঃ বুদ্ধ সেই মতের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন একথাও বলা যাইতে পারে।

অশ্রুজল।

(চিত্রদর্শনে)

১

তুষার উপরে বুকটি চাপিয়া
বালিকা কাঁদিছে জ্বলে’,
দু’টি আঁখি হ’তে ঝরে অশ্রুবারি
প্রণয় ভেঙ্গেছে বলে’।

২
পৌষরজনী, শিহরে অধর
শীর্ণ শিশির পরে ;
শাদা মুখখানি ঝক্ ঝক্ করে
স্তব্ধ চাঁদের করে।
৩
যে প্রণয়ভরে সঁপেছে পরাণ
যাহার চরণতলে,
এত কে নিঠুর ? ভেঙ্গেছে যে মন
প্রণয় সুখের ছলে।
৪
ভাঙ্গিলে হৃদয় গড়িতে পারে না
শীতের চাঁদিমা রাতে ;
বসন্ত এ নয়—মলয় বহিয়ে
ফিরাবে আরেক পথে।
৫
জীবনের সখা হারালে যৌবনে
এমনি অদৃষ্ট ওর ;
বরফের পরে বুক পাতি' তাই
করিছে তপস্যা ঘোর।
৬
ঝরিছে ঝরুক—ওই অশ্রুধারে
শ্যামল হইবে ধরা,
শীতের তুষারে দেখ সবে চেয়ে
কোমল কুসুমঝরা!

রীতিমত নভেল।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

"আল্লা হো আক্‌বর্‌" শব্দে রণভূমি প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। একদিকে তিন লক্ষ যবন সেনা, অন্যদিকে তিন সহস্র আর্য্য সৈন্য। বন্যার মধ্যে একাকী অশ্বত্থ বৃক্ষের মত হিন্দুবীরগণ সমস্ত রাত্রি এবং সমস্ত দিন যুদ্ধ করিয়া অটল দাঁড়াইয়া ছিল, কিন্তু এইবার ভাঙ্গিয়া পড়িবে তাহার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। এবং সেই সঙ্গে ভারতের জয়ধ্বজা ভূমিসাৎ হইবে, এবং আজিকার ঐ অস্তাচলবর্ত্তী সহস্ররশ্মির সহিত হিন্দুস্থানের গৌরবসূর্য্য চিরদিনের মত অস্তমিত হইবে।

হর হর বোম্‌ বোম্‌! পাঠক, বলিতে পার, কে ঐ দৃপ্ত যুবা পঁয়ত্রিশ জন মাত্র অনুচর লইয়া মুক্ত অসি হস্তে অশ্বারোহণে ভারতের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর করনিক্ষিপ্ত দীপ্ত বজ্রের ন্যায় শত্রু-সৈন্যের উপরে আসিয়া পতিত হইল! বলিতে পার, কাহার প্রতাপে এই অগণিত যবন সৈন্য প্রচণ্ড বাত্যাহত অরণ্যানীর ন্যায় বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল! কাহার বজ্রমন্দ্রিত "হর হর বোম্‌ বোম্‌" শব্দে তিন লক্ষ ম্লেচ্ছকণ্ঠের "আল্লাহো আকবর" ধ্বনি নিমগ্ন হইয়া গেল, কাহার উদ্যত অসির সম্মুখে ব্যাঘ্র-আক্রান্ত মেষযূথের ন্যায় শত্রুসৈন্য মুহূর্ত্তের মধ্যে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়নপর হইল!—বলিতে পার, সেদিনকার আর্য্যস্থানের সূর্য্যদেব সহস্র রক্তকরস্পর্শে কাহার রক্তাক্ত তরবারীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া অস্তাচলে বিশ্রাম করিতে গেলেন! বলিতে পার কি পাঠক?

ইনিই সেই ললিত সিংহ। কাঞ্চীর সেনাপতি। ভারত-ইতিহাসের ধ্রুব নক্ষত্র।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আজ কাঞ্চীনগরে কিসের এত উৎসব? পাঠক জান কি? হর্ম্ম্যশিখরে জয়ধ্বজা কেন এত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে? কেবল কি বায়ুভরে,না আনন্দভরে? দ্বারে দ্বারে কদলীতরু ও মঙ্গল ঘট, গৃহে গৃহে শঙ্খধ্বনি, পথে পথে দীপমালা। পুরপ্রাচীরের উপর লোকে লোকারণ্য। নগরের লোক কাহার জন্য এমন উৎসুক হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছে। সহসা পুরুষকণ্ঠের জয়ধ্বনি এবং বামাকণ্ঠের হুলুধ্বনি একত্র মিশ্রিত হইয়া অভ্রভেদ করিয়া অনিমেষ নক্ষত্রলোকের দিকে উত্থিত হইল। নক্ষত্রশ্রেণী বায়ুব্যাহত দীপমালার ন্যায় কাঁপিতে লাগিল। ঐ যে প্রমত্ত তুরঙ্গমের উপর আরোহণ করিয়া বীরবর পুরদ্বারে প্রবেশ করিতেছেন, উঁহাকে চিনিয়াছ কি? উনিই আমাদের সেই পূর্ব্বপরিচিত ললিত সিংহ, কাঞ্চীর সেনাপতি। শত্রু নিধন করিয়া স্বীয় প্রভু কাঞ্চীরাজপদতলে শত্রুরক্তাঙ্কিত খড়্গ উপহার দিতে আসিয়াছেন। তাই এত উৎসব।

কিন্তু এত যে জয়ধ্বনি, সেনাপতির সে দিকে কর্ণপাত নাই, গবাক্ষ হইতে পুরললনাগণ এত যে পুষ্পবৃষ্টি করিতেছেন সেদিকে তাঁহার দৃক্‌পাত নাই। অরণ্যপথ দিয়া যখন তৃষ্ণাতুর পথিক সরোবরের দিকে ধাবিত হয় তখন শুষ্ক পত্ররাশি তাঁহার মাথার উপর ঝরিতে থাকিলে তিনি কি ভ্রূক্ষেপ করেন? অধীরচিত্ত ললিত সিংহের নিকট এই অজস্র সম্মান সেই শুষ্ক পত্রের ন্যায় নীরস, লঘু ও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হইল। অবশেষে

অশ্ব যখন অন্তঃপুরপ্রাসাদের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইল, তখন মুহূর্ত্তের জন্য সেনাপতি তাহার বল্গা আকর্ষণ করিলেন, অশ্ব মুহূর্ত্তের জন্য স্তব্ধ হইল, মুহূর্ত্তের জন্য ললিত সিংহ একবার প্রাসাদবাতায়নে তৃষিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, মুহূর্ত্তের জন্য দেখিতে পাইলেন, দুইটি লজ্জানত নেত্র একবার চকিতের মত তাঁহার মুখের উপর পড়িল এবং দুইটি অনিন্দিত বাহু হইতে একটি পুষ্পমালা খসিয়া তাঁহার সম্মুখে ভূতলে পতিত হইল। তৎক্ষণাৎ অশ্ব হইতে নামিয়া সেই মালা কিরীটচূড়ায় তুলিয়া লইলেন এবং আর একবার কৃতার্থ দৃষ্টিতে উর্দ্ধে চাহিলেন। তখন দ্বার রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, দীপ নির্ব্বাপিত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সহস্র শত্রুর নিকট যে অবিচলিত, দুইটি চকিত হরিণনেত্রের নিকট সে পরাভূত। সেনাপতি বহুকাল ধৈর্য্যকে পাষাণদুর্গের মত হৃদয়ে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, গতকল্য সন্ধ্যাকালে দুটি কালো চোখের সলজ্জ সসম্ভ্রম দৃষ্টি সেই দুর্গের ভিত্তিতে গিয়া আঘাত করিয়াছে এবং এতকালের ধৈর্য্য মুহূর্ত্তে ভূমিসাৎ হইয়া গেছে! কিন্তু ছিছি সেনাপতি, তাই বলিয়া কি সন্ধ্যার অন্ধকারে চোরের মত রাজান্তঃপুরের উদ্যান-প্রাচীর লঙ্ঘন করিতে হয়! তুমিই না ভুবনবিজয়ী বীরপুরুষ!

কিন্তু যে উপন্যাস লেখে, তাহার কোথাও বাধা নাই; দ্বারীরাও দ্বাররোধ করে না, অসূর্য্যম্পশ্যারূপা রমণীরাও আপত্তি প্রকাশ করে না। অতএব, এই সুরম্য বসন্তসন্ধ্যায় দক্ষিণবায়ুবীজিত রাজান্তঃপুরের নিভৃত উদ্যানে একবার প্রবেশ করা যাক্—হে পাঠিকা, তোমরাও আইস, এবং পাঠকগণ, ইচ্ছা

করিলে তোমরাও অনুবর্ত্তী হইতে পার আমি অভয়দান করিতেছি।

একবার চাহিয়া দেখ, বকুলতলে তৃণশয্যায় সন্ধ্যাতারার প্রতিমার মত ঐ রমণী কে? হে পাঠক, হে পাঠিকা তোমরা উঁহাকে জান কি? অমন রূপ কোথাও দেখিয়াছ? রূপের কি কথন বর্ণনা করা যায়? ভাষা কি কথনও কোন মন্ত্রবলে এমন জীবন, যৌবন এবং লাবণ্যে ভরিয়া উঠিতে পারে! হে পাঠক, তোমার যদি দ্বিতীয় পক্ষের বিবাহ হয় তবে স্ত্রীর মুখ স্মরণ কর! হে রূপসি পাঠিকা, যে যুবতীকে দেখিয়া তুমি সঙ্গিনীকে বলিয়াছ "ইহাকে কি এমন ভাল দেখিতে ভাই! হোক্ সুন্দরী, কিন্তু ভাই তেমন শ্রী নাই" তাহার মুখ মনে কর, ঐ তরুতলবর্ত্তিনী রাজকুমারীর সহিত তাহার কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য উপলব্ধি করিবে। পাঠক এবং পাঠিকা, এবার চিনিলে কি? উনিই রাজকন্যা বিদ্যুন্মালা।

রাজকুমারী কোলের উপর ফুল রাখিয়া নতমুখে মালা গাঁথিতেছেন, সহচরী কেহই নাই। গাঁথিতে গাঁথিতে এক একবার অঙ্গুলি আপনার সুকুমার কার্য্যে শৈথিল্য করিতেছে, উদাসীন দৃষ্টি কোন্ এক অতিদূরবর্ত্তী চিন্তারাজ্যে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে। রাজকুমারী কি ভাবিতেছেন? কিন্তু হে পাঠক, সে প্রশ্নের উত্তর আমি দিব না। কুমারীর নিভৃত হৃদয়মন্দিরের মধ্যে আজি এই নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় কোন্ মর্ত্ত্যদেবতার আরতি হইতেছে, অপবিত্র কৌতূহল লইয়া সেখানে প্রবেশ করিতে পারিব না। ঐ দেখ একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পূজার সুগন্ধি ধূপধূমের ন্যায় সন্ধ্যার বাতাসে মিশাইয়া গেল, এবং দুই ফোঁটা অশ্রুজল দুটি কোমল পুষ্পকোরকের মত অজ্ঞাত দেবতার চরণের উদ্দেশে খসিয়া পড়িল।

এমন সময়ে পশ্চাৎ হইতে একটি পুরুষের কণ্ঠ গভীর আবেগ-ভরে কম্পিত রুদ্ধস্বরে বলিয়া উঠিল "রাজকুমারি!" রাজকন্যা সহসা ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। চারিদিক হইতে প্রহরী ছুটিয়া আসিয়া অপরাধীকে বন্দী করিল। রাজকন্যা তখন পুনরায় সসংজ্ঞ হইয়া দেখিলেন সেনাপতি বন্দী হইয়াছেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

এ অপরাধে প্রাণদণ্ডই বিধান। কিন্তু পূর্ব্বোপকার স্মরণ করিয়া রাজা তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করিয়া দিলেন। সেনাপতি মনে মনে কহিলেন "দেবি, তোমার নেত্রও যখন প্রতারণা করিতে পারে, তখন সত্য পৃথিবীতে কোথাও নাই। আজ হইতে আমি মানবের শত্রু।" একটি বৃহৎ দস্যুদলের অধিপতি হইয়া ললিত সিংহ অরণ্যে বাস করিতে লাগিলেন।

হে পাঠক, তোমার আমার মত লোক এরূপ ঘটনায় কি করিত? নিশ্চয়, যেখানে নির্ব্বাসিত হইত সেখানে আর একটা চাকরীর চেষ্টা দেখিত, কিম্বা একটা নূতন খবরের কাগজ বাহির করিত। কিছু কষ্ট হইত সন্দেহ নাই—সে অন্নাভাবে। কিন্তু সেনাপতির মত মহৎলোক, যাহারা উপন্যাসে সুলভ এবং পৃথিবীতে দুর্লভ, তাহারা চাকরীও করে না, খবরের কাগজও চালায় না। তাহারা যখন সুখে থাকে তখন এক নিঃশ্বাসে নিখিল জগতের উপকার করে, এবং মনোবাঞ্ছা তিলমাত্র ব্যর্থ হইলেই আরক্তলোচনে বলে, "রাক্ষসী পৃথিবী, পিশাচ সমাজ, তোদের বুকে পা দিয়া আমি ইহার প্রতিশোধ লইব" বলিয়া তৎক্ষণাৎ দস্যুব্যবসায় আরম্ভ করে; এইরূপ ইংরাজিকাব্যে পড়া যায় এবং অবশ্যই এ প্রথা রাজপুতদের মধ্যেও প্রচলিত ছিল।

দস্যুর উপদ্রবে দেশের লোক ত্রস্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু এই অসামান্য দস্যুরা অনাথের সহায়, দরিদ্রের বন্ধু, দুর্ব্বলের পক্ষ, কেবল ধনী, উচ্চকুলজাত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং রাজকর্ম্মচারী-দের পক্ষে কালান্তক যম।

ঘোর অরণ্য। সূর্য্য অস্তপ্রায়। কিন্তু বনচ্ছায়ায় অকাল রাত্রির আবির্ভাব হইয়াছে। তরুণ যুবক অপরিচিত পথে একাকী চলিতেছে। সুকুমার শরীর পথশ্রমে ক্লান্ত, কিন্তু তথাপি অধ্য-বসায়ের বিরাম নাই। কটিদেশে যে তরবারী বদ্ধ রহিয়াছে তাহারই ভার দুঃসহ বোধ হইতেছে। অরণ্যে লেশমাত্র শব্দ হইলেই ভয়প্রবণ হৃদয় হরিণের মত চকিত হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু তথাপি এই আসন্ন রাত্রি এবং অজ্ঞাত অরণ্যের মধ্যে দৃঢ় সংকল্পের সহিত অগ্রসর হইতেছে।

দস্যুরা আসিয়া দস্যুপতিকে সংবাদ দিল, "মহারাজ, বৃহৎ শীকার মিলিয়াছে। মাথায় মুকুট, রাজবেশ, কটিদেশে তরবারী।" দস্যুপতি কহিলেন "তবে এ শীকার আমার। তোরা এখানেই থাক্!"

পথিক চলিতে চলিতে সহসা একবার শুষ্ক পত্রের খস্ খস্ শব্দ শুনিতে পাইল। উৎকণ্ঠিত হইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। সহসা বুকের মাঝখানে তীর আসিয়া বিঁধিল, পান্থ "মা" বলিয়া ভূতলে পড়িয়া গেল।

দস্যুপতি নিকটে আসিয়া জানু পাতিয়া নত হইয়া আহতের মুখের দিকে নিরীক্ষণ করিলেন। ভূতলশায়ী পথিক দস্যুর হাত ধরিয়া কেবল একবার মৃদুস্বরে কহিল "ললিত!"

মুহূর্ত্তে দস্যুর হৃদয় যেন সহস্র খণ্ডে ভাঙ্গিয়া এক চীৎকার শব্দ বাহির হইল "রাজকুমারী!"

দস্যুরা আসিয়া দেখিল শীকার এবং শিকারী উভয়েই অন্তিম আলিঙ্গনে বদ্ধ হইয়া মৃত পড়িয়া আছে।

রাজকুমারী একদিন সন্ধ্যাকালে তাঁহার অন্তঃপুরের উদ্যানে অজ্ঞানে ললিতের উপর রাজদণ্ড নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, ললিত আর একদিন সন্ধ্যাকালে অরণ্যের মধ্যে অজ্ঞানে রাজকন্যার প্রতি শরনিক্ষেপ করিল। সংসারের বাহিরে যদি কোথাও মিলন হইয়া থাকে ত আজ উভয়ের অপরাধ উভয়ে বোধ করি মার্জ্জনা করিয়াছে।

সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা।

নব্যভারত। জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়। মেঘনাদবধচিত্র। বহুকাল হইল প্রথম বর্ষের ভারতীতে মেঘনাদবধ কাব্যের এক দীর্ঘ সমালোচনা বাহির হইয়াছিল, লেখক মহাশয় এই প্রবন্ধে তাহার প্রতিবাদ প্রকাশ করিতেছেন। তিনি যদি জানিতেন ভারতীর সমালোচক তৎকালে একটি পঞ্চদশবর্ষীয় বালক ছিল তবে নিশ্চয়ই উক্ত লোকবিস্মৃত সমালোচনার বিস্তারিত প্রতিবাদ বাহুল্য বোধ করিতেন।—রিজ্‌লি সাহেবের নবপ্রকাশিত গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া ক্ষীরোদচন্দ্র বাবু ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধি নামক যে প্রবন্ধ সংকলন করিয়াছেন, তাহাতে, ভারতবর্ষের অনার্য্যজাতীয়েরা কি করিয়া ব্রাহ্মণ্যের গণ্ডীর মধ্যে অল্পে অল্পে প্রবেশ লাভ করিয়াছে তাহার কথঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়—প্রবন্ধটি নিরতিশয় সংক্ষিপ্ত হওয়ায় আমরা যথেষ্ট তৃপ্তি লাভ

করিলাম না।—সাকার ও নিরাকার উপাসনা। ইহাতে যে সকল তর্ক অবলম্বিত হইয়াছে তাহা এতই সরল, যে, সহসা মনে প্রশ্ন উদয় হয় এ সকল কথা কি কাহাকেও বিশেষ করিয়া বুঝানো আবশ্যক? দুঃখের বিষয় এই যে, আবশ্যক আছে। আরো দুঃখের বিষয় এই যে যাঁহারা মনে মনে এ সমস্তই বুঝেন, তাঁহারাও নানারূপ কৃত্রিম কূট তর্ক উদ্ভাবন করিতেছেন, সুতরাং এ যুক্তিগুলি স্থলবিশেষে ভুল ভাঙ্গিবার এবং স্থলবিশেষে কেবল-মাত্র মুখবন্ধ করিবার জন্য আবশ্যক হইয়াছে।—**অনাহারে মরণ।** বাল্যকাল হইতে যথেষ্ট পুষ্টিকর আহার পায় না বলিয়া যে বাঙ্গালী জাতির মনুষ্যত্ব অসম্পূর্ণ থাকে এ কথা আমরা লেখকের সহিত স্বীকার করি। শরীর অপুষ্ট থাকাতে আমাদের চরিত্রের ভিত্তি কাঁচা থাকিয়া যায়। লেখকের মতের সহিত আমাদের সম্পূর্ণ ঐক্য আছে কেবল তাঁহার রচনার দুই এক স্থলে আমাদের খট্‌কা লাগিয়াছে। এক স্থলে আছে "তাঁহারা বাক্যসার বক্তাদিগের অপেক্ষা ভাল স্বদেশপ্রেমিক "better patriots"।" ইংরাজি কথাটা জুড়িয়া দিবার অত্যাবশ্যক কারণ বুঝিতে পারিলাম না। প্রবন্ধের উপসংহারে গদ্য সহসা বিনা নোটিসে একপ্রকার ভাঙ্গাছন্দ পদ্যে পরিণত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য বুঝা কঠিন। সেই জন্য এই আড়ম্বরহীন গম্ভীর প্রবন্ধ শেষকালটায় হঠাৎ এক অদ্ভুত আকার ধারণ করিয়াছে; সংযতবেশ ভদ্রলোক সভাস্থলে অকস্মাৎ নটের ভাব ধারণ করিলে যেমন হয় সেইরূপ। শেষ অংশটুকু বিচ্ছিন্ন করিয়া একটা স্বতন্ত্র পদ্য রচনা করিলে এরূপ খাপছাড়া হইত না।

সাহিত্য। শ্রাবণ। মধুচ্ছন্দার সোমযাগ। বেদে যে সোমযাগের উল্লেখ আছে এই অতি উপাদেয় প্রবন্ধে তাহারই

আলোচনা উত্থাপিত হইয়াছে। লেখক মহাশয় বলেন বৈদিক ঋষিদের মধ্যে "মধুবিদ্যা" নামক একটি গোপনীয় বিদ্যা ছিল। সেই বিদ্যার রহস্য যে জ্ঞানীরা অবগত ছিলেন তাঁহাদের নিকট মধু অর্থাৎ সোম অর্থে ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মানন্দ। লেখক বলিতেছেন, "ঋগ্বেদের প্রথমেই মধুচ্ছন্দা নামক এক ঋষির কয়েকটি মন্ত্র আছে সেই মন্ত্রগুলির আদ্যন্ত আলোচনা করিলে, মধুচ্ছন্দার সোমযাগ কিরূপ ছিল, পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন।" এবারকার সংখ্যায়, মধুচ্ছন্দা ঋষি কে, তাহারই আলোচনা হইয়াছে। সোমযাগ কি তাহা জানিবার জন্য কৌতূহল রহিল। উপাধি-উৎপাত প্রবন্ধে লেখক মনের আক্ষেপ তেজের সহিত প্রকাশ করিয়াছেন। যাঁহাদের আত্মসম্মান আপনাতেই পর্য্যাপ্ত, যাঁহারা রাজসম্মান চাহেন না, এমন কি, প্রত্যাখ্যান করেন, তাঁহাদের মত মানী লোক জগতে সর্ব্বত্রই দুর্লভ। কিন্তু সাধারণতঃ যাঁহারা রাজোপাধি লাভ করিয়া গৌরব অনুভব করেন তাঁহারা কি এতই তীব্র আক্রমণের যোগ্য! তাঁহাদের মধ্যে কি দেশের অনেক যথার্থ সারবান্ যোগ্য লোক নাই? উপাধি যদি স্থলবিশেষে অযোগ্য পাত্রে বর্ষিত হয় তবে সে রাজার দোষ—কিন্তু যাঁহারা রাজসম্মানের চিহ্নস্বরূপ উপাধি প্রাপ্ত হইয়া সন্তোষলাভ করেন তাঁহাদিগকে দোষ দেওয়া যায় না। কেবল রাজাদের কেন, পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায় জনাদরও অনেক সময় যোগ্যপাত্রকে উপেক্ষা করিয়া অযোগ্য পাত্রে ন্যস্ত হয়, তাই বলিয়া জনাদর যে নিতান্তই অবজ্ঞার সামগ্রী তাহা বলিতে পারি না। সম্মান, আদর মনুষ্যের নিকট চিরকাল প্রিয়, মানুষের এ দুর্ব্বলতার জন্য স্থলবিশেষে ঈষৎ হাস্যের উদ্রেক হইতে পারে কিন্তু এতটা তর্জ্জন কিছু যেন বেশি হইয়াছে বলিয়া মনে

হয়। বিশেষতঃ, বঙ্কিমবাবু গবর্মেণ্টের হস্ত হইতে রায় বাহাদুর উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া লেখক যে আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা আমাদের নিকট নিতান্ত অযথা বলিয়া বোধ হয়। কারণ, বঙ্কিম বাবু বঙ্গদেশের দেশমান্য লেখক বলিয়া গবর্মেণ্ট তাঁহাকে উপাধি দেন নাই—তিনি গবর্মেণ্টের পুরাতন কর্ম্মচারী—তাঁহার যোগ্যতা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠায় সন্তুষ্ট হইয়া গবর্মেণ্ট যদি তাঁহাকে যথোচিত সম্মানচিহ্ন দান করেন তাহা অবজ্ঞা করিলে তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত অশোভন এবং অন্যায় কার্য্য হইত সন্দেহ নাই। বঙ্কিম বাবু দেশের জন্য যাহা করিয়াছেন দেশের লোক তজ্জন্য তাঁহাকে অত্যন্ত উচ্চ আসন দিয়াছে—তিনি রাজার জন্য যাহা করিয়াছেন সে কাজ স্বতন্ত্র প্রকৃতির, তাহার পুরস্কারও স্বতন্ত্র শ্রেণীর—তাহার সহিত হৃদয়ের বিশেষ যোগ নাই, সে সমস্তই যথানির্দ্দিষ্ট নিয়মানুগত—অতএব তাহা লইয়া ক্ষোভ করিতে বসা মিথ্যা। উপাধি লওয়া সম্বন্ধে কার্লাইল ও টেনিসনের সহিত বঙ্কিম বাবুর তুলনা ঠিক খাটে নাই। যাহা হউক, লেখাটি ভাল হইয়াছে সন্দেহ নাই। বন্ধু গল্পটির মধ্যে পশ্চিমাঞ্চলের স্নিগ্ধ শ্রাবণ মাস বেশ একটি সঙ্গীত-মিশ্রিত সৌন্দর্য্য নিক্ষেপ করিয়াছে।—আদর্শ সমালোচনা। বোধ করি এমন ভাগ্যবান সমালোচক কখনো জন্মেন নাই যিনি আপন কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন করিয়া অক্ষত শরীরে পৃথিবী হইতে অপসৃত হইতে পারিয়াছেন। যখন উক্ত অপ্রিয় কর্ত্তব্য স্কন্ধে লইয়াছি তখন আমরাও যে সহজে অব্যাহতি পাইব এমন দুরাশা আমাদের নাই। অতএব "আদর্শ-সমালোচনা"-লেখক যে গুপ্তভাবে আমাদের প্রতি বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন সে জন্য আমরা লেশমাত্র আশ্চর্য্য বা দুঃখিত হই

নাই। দুঃখের বিষয় এই যে, লেখকের নিপুণতার আমরা প্রশংসা করিতে পারিলাম না। আমরা বন্ধুভাবে তাঁহাকে পরামর্শ দিতে পারি যে, তিনি যদি রসিকতা প্রকাশের নিষ্ফল চেষ্টা না করিয়া অন্য কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন ত হয় ত কৃতকার্য্য হইতেও পারেন। কালিদাস ও সেক্ষপিয়র লেখার মধ্যে যথেষ্ট চিন্তাশীলতা আছে, আমরা ইহার পরিণামের জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিলাম। আমার "স্বরচিত" লয়তত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য তাহা সাহিত্যেই লিখিয়া পাঠাইয়াছি। এখানে কেবল সংক্ষেপে একটি কথা বলিয়া রাখি। আমরা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, ক্ষুদ্র অনুরাগ বৃহৎ অনুরাগে পরিণত হইতে পারে কিন্তু বৃহৎ অনুরাগ কি করিয়া নিরনুরাগে লইয়া যাইবে আমরা বুঝিতে পারি না। চন্দ্রনাথ বাবু তাহার উত্তরে লিখিয়াছেন, ছোট অনুরাগ যখন স্বদেশানুরাগ প্রভৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন বা বিপরীত প্রকৃতির বড় অনুরাগে পরিণত হইতেছে তখন বড় অনুরাগ নিরনুরাগে পরিণত হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। এক শক্তি ভিন্ন শক্তিতে রূপান্তরিত হইতে পারে বলিয়াই শক্তির ধ্বংশ হওয়া আশ্চর্য্য নহে এরূপ যুক্তি আমরা প্রত্যাশা করি নাই। দেখিতেছি আমাদের আলোচনা ক্রমশঃ কথাকাটাকাটিতে পরিণত হইতেছে, অতএব এ আলোচনা এইখানেই লয় প্রাপ্ত হইলে মন্দ হয় না।

স্বরলিপি ।*

তুমি কি লো তোমারি তরে
—শুধু তোমারি তরে,
ফুটিয়ে উঠেছ,
আছ গরব-ভরে ?
বাসে আপনি বিভোর,
চখে ঘন ঘুম-ঘোর,
ফিরে চাহিতে চাহনা যেন
অমর-নরে !

৪|২

।২´।৩।০।১।

২´ ॥ ৩ ০
না না ॥ র্সা র্সা না র্সর্রা । র্সা ঞা ধা -া । না না না র্সর্রা ।
তু মি ॥ কি লো তো মা । রি ত রে — । শু ধু তো মা ।

১
। র্সা ঞা ধা -া । পা পা মা মা । গা রা পা পা ।
। রি ত রে — । ফু টি য়ে উ । ঠে ছ আ ছ ।

। মা গা মা রা । সা -া না না ॥ মা গা । মা মা ধা না ।
। গ র ব ভ । রে — (তু মি) ॥ বা সে । আ প নি বি ।

। র্সা -া না র্সা । র্গা র্গা র্রা না । র্সা -া র্সা না ।
। ভো র্ চো খে । ঘ ন ঘু ম । ঘো র্ ফি রে ।

---

* "সাধনার" জনৈক গ্রাহক শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই গানের স্বর-লিপি পাঠাইয়াছেন।

। র্সা র্গা র্মা র্পা। র্মা র্গা র্রা র্সা। না র্সর্রা র্সা ঞা।
। চা হি তে চা। হ না যে ন। অ ম র ন।

। ধা -া না না ॥
। রে — (তু মি) ॥

চিহ্নের ব্যাখ্যা।

১। কলির শেষে যেখানে যুগল ছেদ দেখিবে সেইখানে ছাড়িয়া দিয়া আস্থায়ীর আরম্ভের যুগল ছেদের পর হইতে পুনরাবৃত্তি করিবে। অর্থাৎ আস্থায়ীতে ফিরিয়া গিয়া "তুমি" ছাড়িয়া একেবারে "কি লো" হইতে ধরিবে। এবং "কি লো" এইটুকুমাত্র গাহিয়া আবার অন্তরা ধরিবে; তাই, "কি লো" র পরে শিরোদেশে যুগল-ছেদ প্রযুক্ত হইয়াছে।

২। এক ছেদ হইতে ছেদান্তর পর্য্যন্ত সুরগুলি এক পদের অর্থাৎ এক তাল-বিভাগের অন্তর্গত। এই প্রতি পদ-বিভাগের প্রথম সুরের উপর তালি কিম্বা ফাঁক পড়ে। কাওয়ালি তালে তিন তালি, এক ফাঁক। ১, ২́, ৩ এই তিন তালির চিহ্ন ও ০ ফাঁকের চিহ্ন। যে সংখ্যার উপর রেফ্ থাকে সেইটি সম। কাওয়ালি তালে দ্বিতীয় তালিতেই সম পড়ে। এই গানের আরম্ভ সম হইতে।

সাধনা।

জয় পরাজয়।

রাজকন্যার নাম অপরাজিতা। উদয়নারায়ণের সভাকবি শেখর তাঁহাকে কখন চক্ষেও দেখেন নাই। কিন্তু যেদিন কোন নূতন কাব্য রচনা করিয়া সভাতলে বসিয়া রাজাকে শুনাইতেন, সেদিন কণ্ঠস্বর ঠিক এতটা উচ্চ করিয়া পড়িতেন, যাহাতে তাহা সেই সমুচ্চ গৃহের উপরিতলের জালায়নবর্ত্তিনী অদৃশ্য শ্রোত্রীগণের কর্ণপথে প্রবেশ করিতে পারে। যেন তিনি কোন এক অগম্য নক্ষত্রলোকের উদ্দেশে আপনার সঙ্গীতোচ্ছ্বাস প্রেরণ করিতেন, যেখানে জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর মধ্যে তাঁহার জীবনের একটি অপরিচিত শুভগ্রহ অদৃশ্য মহিমায় বিরাজ করিতেছেন।

কখন ছায়ার মতন দেখিতে পাইতেন, কখন নূপুরশিঞ্জনের মতন শুনা যাইত; বসিয়া বসিয়া মনে মনে ভাবিতেন, সে কেমন দুইখানি চরণ যাহাতে সেই সোণার নূপুর বাঁধা থাকিয়া তালে তালে গান গাহিতেছে! সেই দুইখানি রক্তিম শুভ্র কোমল চরণতল প্রতি পদক্ষেপে কি সৌভাগ্য কি অনুগ্রহ কি করুণার মত করিয়া পৃথিবীকে স্পর্শ করে। মনের মধ্যে সেই চরণ দুটি প্রতিষ্ঠা করিয়া কবি অবসরকালে সেইখানে আসিয়া লুটাইয়া পড়িত এবং সেই নূপুরশিঞ্জনের সুরে আপনার গান বাঁধিত।

কিন্তু যে ছায়া দেখিয়াছিল, যে নূপুর শুনিয়াছিল, সে কাহার ছায়া কাহার নূপুর এমন তর্ক এমন সংশয় তাহার ভক্তহৃদয়ে কখন উদয় হয় নাই।

রাজকন্যার দাসী মঞ্জরী যখন ঘাটে যাইত, শেখরের ঘরের সম্মুখ দিয়া তাহার পথ ছিল। আসিতে যাইতে কবির সঙ্গে তাহার দুটা কথা না হইয়া যাইত না। তেমন নির্জ্জন দেখিলে সে সকালে সন্ধ্যায় শেখরের ঘরের মধ্যে গিয়াও বসিত। যতবার সে ঘাটে যাইত ততবার যে তাহার আবশ্যক ছিল এমনও বোধ হইত না, যদি বা আবশ্যক ছিল এমন হয়, কিন্তু ঘাটে যাইবার সময় উহারই মধ্যে একটু বিশেষ যত্ন করিয়া একটা রঙীন্ কাপড় এবং কানে দুইটা আম্রমুকুল পরিবার কোন উচিত কারণ পাওয়া যাইত না।

লোকে হাসাহাসি কানাকানি করিত। লোকের কোন অপরাধ ছিল না। মঞ্জরীকে দেখিলে শেখর বিশেষ আনন্দলাভ করিতেন তাহা গোপন করিতেও তাঁহার তেমন প্রয়াস ছিল না। তাহার নাম ছিল মঞ্জরী; বিবেচনা করিয়া দেখিলে সাধারণ লোকের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট ছিল, কিন্তু শেখর আবার আরও একটু কবিত্ব করিয়া তাহাকে বসন্তমঞ্জরী বলিতেন। লোকে শুনিয়া বলিত,আ সর্ব্বনাশ! আবার কবির বসন্ত-বর্ণনার মধ্যে— "মঞ্জুল বঞ্জুল মঞ্জরী" এমনতর অনুপ্রাসও মাঝে মাঝে পাওয়া যাইত। এমন কি, জনরব রাজার কানেও উঠিয়াছিল। রাজা তাঁহার কবির এইরূপ রসাধিক্যের পরিচয় পাইয়া বড়ই আমোদ বোধ করিতেন—তাহা লইয়া কৌতুক করিতেন, শেখরও তাহাতে যোগ দিতেন। রাজা হাসিয়া প্রশ্ন করিতেন, "ভ্রমর কি কেবল বসন্তের রাজসভায় গান গায়"—কবি উত্তর দিতেন, "না, পুষ্পমঞ্জরীর মধুও খাইয়া থাকে।"

এমনি করিয়া সকলেই হাসিত, আমোদ করিত; বোধ করি অন্তঃপুরে রাজকন্যা অপরাজিতাও মঞ্জরীকে লইয়া মাঝে মাঝে উপহাস করিয়া থাকিবেন। মঞ্জরী তাহাতে অসন্তুষ্ট হইত না।

এমনি করিয়া সত্যে মিথ্যায় মিশাইয়া মানুষের জীবন এক-রকম করিয়া কাটিয়া যায়—খানিকটা বিধাতা গড়েন, খানিকটা আপনি গড়ে, খানিকটা পাঁচজনে গড়িয়া দেয়; জীবনটা একটা পাঁচমিশালি রকমের জোড়াতাড়া; প্রকৃত এবং অপ্রকৃত, কাল্পনিক এবং বাস্তবিক।

কেবল কবি যে গানগুলি গাহিতেন তাহাই সত্য এবং সম্পূর্ণ। গানের বিষয় সেই রাধা এবং কৃষ্ণ—সেই চিরন্তন নর এবং চিরন্তন নারী, সেই অনাদি দুঃখ এবং অনন্ত সুখ। সেই গানেই তাঁহার যথার্থ নিজের কথা ছিল—এবং সেই গানের যাথার্থ্য অমরাপুরের রাজা হইতে দীনদুঃখী প্রজা পর্য্যন্ত সকলেই আপনার হৃদয়ে হৃদয়ে পরীক্ষা করিয়াছিল। তাঁহার গান সকলেরই মুখে। জ্যোৎস্না উঠিলেই, একটু দক্ষিণা বাতাসের আভাস দিলেই অমনি দেশের চতুর্দ্দিকে কত কানন, কত পথ, কত নৌকা, কত বাতায়ন, কত প্রাঙ্গণ হইতে তাঁহার রচিত গান উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত—তাঁহার খ্যাতির আর সীমা ছিল না।

এইভাবে অনেক দিন কাটিয়া গেল। কবি কবিতা লিখিতেন, রাজা শুনিতেন, রাজসভার লোক বাহবা দিত, মঞ্জরী ঘাটে আসিত, এবং অন্তঃপুরের বাতায়ন হইতে কখন কখন একটা ছায়া পড়িত, কখন কখন একটা নূপুর শুনা যাইত।

২

এমন সময়ে দাক্ষিণাত্য হইতে এক দিগ্বিজয়ী কবি শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত ছন্দে রাজার স্তবগান করিয়া রাজসভায় আসিয়া

দাঁড়াইলেন। তিনি স্বদেশ হইতে বাহির হইয়া পথিমধ্যে সমস্ত রাজকবিদিগকে পরাস্ত করিয়া অবশেষে অমরাপুরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। রাজা পরম সমাদরের সহিত কহিলেন "এহি, এহি!" কবি পুণ্ডরীক দম্ভভরে কহিলেন "যুদ্ধং দেহি।"

রাজার মান রাখিতে হইবে—যুদ্ধ দিতে হইবে, কিন্তু কাব্য-যুদ্ধ যে কিরূপ হইতে পারে শেখরের সে সম্বন্ধে ভালরূপ ধারণা ছিল না। তিনি অত্যন্ত চিন্তিত ও শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। রাত্রে নিদ্রা হইল না। যশস্বী পুণ্ডরীকের দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ, সুতীক্ষ্ণ বক্রনাসা এবং দর্পোদ্ধত উন্নত মস্তক দিগ্বিদিকে অঙ্কিত দেখিতে লাগিলেন।

প্রাতঃকালে কম্পিতহৃদয় কবি রণক্ষেত্রে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। প্রত্যুষ হইতে সভাতল লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গেছে, কলরবের সীমা নাই; নগরে আর সমস্ত কাজকর্ম্ম একেবারে বন্ধ। কবি শেখর বহুকষ্টে মুখে সহাস্য প্রফুল্লতার আয়োজন করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বী কবি পুণ্ডরীককে নমস্কার করিলেন—পুণ্ডরীক প্রচণ্ড অবহেলাভরে নিতান্ত ইঙ্গিতমাত্রে নমস্কার ফিরাইয়া দিলেন এবং নিজের অনুবর্ত্তী ভক্তবৃন্দের দিকে চাহিয়া হাসিলেন। শেখর একবার অন্তঃপুরের জালায়নের দিকে কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন, বুঝিতে পারিলেন সেখান হইতে আজ শত শত কৌতূহলপূর্ণ কৃষ্ণতারকার ব্যগ্রদৃষ্টি এই জনতার উপরে অজস্র নিপতিত হইতেছে। একবার একাগ্রভাবে চিত্তকে সেই ঊর্দ্ধলোকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া আপনার জয়লক্ষ্মীকে বন্দনা করিয়া আসিলেন, মনে মনে কহিলেন "আমার যদি আজ জয় হয় তবে, হে দেবি, হে অপরাজিতা, তাহাতে তোমারি নামের সার্থকতা হইবে।"

তূরী ভেরী বাজিয়া উঠিল। জয়ধ্বনি করিয়া সমাগত সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল। শুক্লবসন রাজা উদয়নারায়ণ শরৎপ্রভাতের শুভ্র মেঘরাশির ন্যায় ধীরগমনে সভায় প্রবেশ করিলেন এবং সিংহাসনে উঠিয়া বসিলেন।

পুণ্ডরীক উঠিয়া সিংহাসনের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বৃহৎ সভা স্তব্ধ হইয়া গেল।

বক্ষ বিস্ফারিত করিয়া গ্রীবা ঈষৎ ঊর্দ্ধে হেলাইয়া বিরাট-মূর্ত্তি পুণ্ডরীক গম্ভীরস্বরে উদয়নারায়ণের স্তব পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। কণ্ঠস্বর ঘরে ধরে না—বৃহৎ সভাগৃহের চারিদিকের ভিত্তিতে স্তম্ভে ছাদে সমুদ্রের তরঙ্গের মত গম্ভীর মন্দ্রে আঘাত প্রতিঘাত করিতে লাগিল, এবং কেবল সেই ধ্বনির বেগে সমস্ত জনমণ্ডলীর বক্ষকবাট থর্ থর্ করিয়া স্পন্দিত হইয়া উঠিল। কত কৌশল, কত কারুকার্য্য, উদয়নারায়ণ নামের কতরূপ ব্যাখ্যা, রাজার নামাক্ষরের কতদিক হইতে কতপ্রকার বিন্যাস, কত ছন্দ, কত যমক! পুণ্ডরীক যখন শেষ করিয়া বসিলেন, কিছুক্ষণের জন্য নিস্তব্ধ সভাগৃহ তাঁহার কণ্ঠের প্রতিধ্বনি ও সহস্র হৃদয়ের নির্ব্বাক্ বিস্ময়রাশিতে গম্ গম্ করিতে লাগিল। বহুদূর দেশ হইতে আগত পণ্ডিতগণ দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া উচ্ছ্বসিত স্বরে সাধু সাধু করিয়া উঠিলেন।

তখন সিংহাসন হইতে রাজা একবার শেখরের মুখের দিকে চাহিলেন। শেখরও ভক্তি প্রণয় অভিমান এবং একপ্রকার সকরুণ সঙ্কোচপূর্ণ দৃষ্টি রাজার দিকে প্রেরণ করিল এবং ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল। রাম যখন লোকরঞ্জনার্থে দ্বিতীয়বার অগ্নিপরীক্ষা করিতে চাহিয়াছিলেন তখন সীতা যেন এইরূপ ভাবে চাহিয়া এম্‌নি করিয়া তাঁহার স্বামীর সিংহাসনের সম্মুখে

দাঁড়াইয়াছিলেন। কবির দৃষ্টি নীরবে রাজাকে জানাইল—"আমি তোমারই! তুমি যদি বিশ্বসমক্ষে আমাকে দাঁড় করাইয়া পরীক্ষা করিতে চাও ত কর। কিন্তু—" তাহার পরে নয়ন নত করিলেন। পুণ্ডরীক সিংহের মত দাঁড়াইয়াছিল, শেখর চারিদিকে ব্যাধবেষ্টিত হরিণের মত দাঁড়াইল। তরুণ যুবক, রমণীর ন্যায় লজ্জা এবং স্নেহ-কোমল মুখ, পাণ্ডুবর্ণ কপোল, শরীরাংশ নিতান্ত স্বল্প, দেখিলে মনে হয় ভাবের স্পর্শমাত্রেই সমস্ত দেহ যেন বীণার তারের মত কাঁপিয়া বাজিয়া উঠিবে।

শেখর মুখ না তুলিয়াই প্রথমে অতি মৃদুস্বরে আরম্ভ করিলেন। প্রথম একটা শ্লোক বোধ হয় কেহ ভাল করিয়া শুনিতে পাইল না। তাহার পরে ক্রমে ক্রমে মুখ তুলিলেন—যেখানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন সেখান হইতে যেন সমস্ত জনতা এবং রাজসভার পাষাণ-প্রাচীর বিগলিত হইয়া বহুদূরবর্ত্তী অতীতের মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া গেল। সুমিষ্ট পরিষ্কার কণ্ঠস্বর কাঁপিতে কাঁপিতে উজ্জ্বল অগ্নিশিখার ন্যায় ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিল। প্রথমে রাজার চন্দ্রবংশীয় আদিপুরুষের কথা আরম্ভ করিলেন। ক্রমে ক্রমে কত যুদ্ধ বিগ্রহ শৌর্য্য বীর্য্য যজ্ঞ দান কত মহদনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া তাঁহার রাজকাহিনীকে বর্ত্তমান কালের মধ্যে উপনীত করিলেন। অবশেষে সেই দূরস্মৃতিবদ্ধ দৃষ্টিকে ফিরাইয়া আনিয়া রাজার মুখের উপর স্থাপিত করিলেন এবং রাজ্যের সমস্ত প্রজাহৃদয়ের একটা বৃহৎ অব্যক্ত প্রীতিকে ভাষায় ছন্দে মূর্ত্তিমান্ করিয়া সভার মাঝখানে দাঁড় করাইয়া দিলেন—যেন দূর দূরান্তর হইতে শত সহস্র প্রজার হৃদয়স্রোত ছুটিয়া আসিয়া রাজপিতামহদিগের এই অতি পুরাতন প্রাসাদকে মহাসঙ্গীতে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিল—ইহার প্রত্যেক ইষ্টককে যেন তাহারা স্পর্শ

করিল, আলিঙ্গন করিল, চুম্বন করিল, ঊর্দ্ধে অন্তঃপুরের জালা-য়ন সম্মুখে উত্থিত হইয়া রাজলক্ষ্মী-স্বরূপা প্রাসাদলক্ষ্মীদের চরণ-তলে স্নেহার্দ্র ভক্তিভরে লুষ্ঠিত হইয়া পড়িল, এবং সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া রাজাকে এবং রাজার সিংহাসনকে মহোল্লাসে শত শতবার করিয়া প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। অবশেষে বলি-লেন, মহারাজ, বাক্যেতে হার মানিতে পারি কিন্তু ভক্তিতে কে হারাইবে! এই বলিয়া কম্পিতদেহে বসিয়া পড়িলেন। তখন অশ্রুজলে অভিষিক্ত প্রজাগণ জয় জয় রবে আকাশ কাঁপাইতে লাগিল।

সাধারণ জনমণ্ডলীর এই উন্মত্ততাকে ধিক্কারপূর্ণ হাস্যের দ্বারা অবজ্ঞা করিয়া পুণ্ডরীক আবার উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দৃপ্তগর্জ্জনে জিজ্ঞাসা করিলেন, বাক্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কে! সকলে এক মুহূর্ত্তে স্তব্ধ হইয়া গেল। তখন তিনি নানা ছন্দে অদ্ভুত পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়া বেদ বেদান্ত আগম নিগম হইতে প্রমাণ করিতে লাগিলেন—বিশ্বের মধ্যে বাক্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বাক্যই সত্য, বাক্যই ব্রহ্ম। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর বাক্যের বশ—অতএব বাক্য তাঁহাদের অপেক্ষা বড়। ব্রহ্মা চারিমুখে বাক্যকে শেষ করিতে পারিতেছেন না—পঞ্চানন পাঁচমুখে বাক্যের অন্ত না পাইয়া অবশেষে নীরবে ধ্যানপরায়ণ হইয়া বাক্য খুঁজিতেছেন। এম্‌নি করিয়া পাণ্ডিত্যের উপর পাণ্ডিত্য এবং শাস্ত্রের উপর শাস্ত্র চাপাইয়া বাক্যের জন্য একটা অভ্রভেদী সিংহাসন নির্ম্মাণ করিয়া বাক্যকে মর্ত্ত্যলোক এবং সুরলোকের মস্তকের উপর বসাইয়া দিলেন এবং পুনর্ব্বার বজ্রনিনাদে জিজ্ঞাসা করিলেন, বাক্যের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কে? দর্পভরে চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করি-লেন; যখন কেহ কোন উত্তর দিল না তখন ধীরে ধীরে আসন

গ্রহণ করিলেন। পণ্ডিতগণ সাধু সাধু ধন্য ধন্য করিতে লাগিল—রাজা বিস্মিত হইয়া রহিলেন এবং কবি শেখর এই বিপুল পাণ্ডিত্যের নিকটে আপনাকে ক্ষুদ্র মনে করিলেন। আজিকার মত সভাভঙ্গ হইল।

৩

পরদিন শেখর আসিয়া গান আরম্ভ করিয়া দিলেন ;—বৃন্দাবনে প্রথম বাঁশি বাজিয়াছে, তখনও গোপিনীরা জানে না, কে বাজাইল—জানে না, কোথায় বাজিতেছে। একবার মনে হইল, দক্ষিণ পবনে বাজিতেছে, একবার মনে হইল উত্তরে গিরিগোবর্দ্ধনের শিখর হইতে ধ্বনি আসিতেছে ; মনে হইল উদয়াচলের উপরে দাঁড়াইয়া কে মিলনের জন্য আহ্বান করিতেছে ; মনে হইল অস্তাচলের প্রান্তে বসিয়া কে বিরহশোকে কাঁদিতেছে ; মনে হইল যমুনার প্রত্যেক তরঙ্গ হইতে বাঁশি বাজিয়া উঠিল, মনে হইল আকাশের প্রত্যেক তারা যেন সেই বাঁশির ছিদ্র—অবশেষে কুঞ্জে কুঞ্জে, পথে ঘাটে, ফুলে ফলে, জলে স্থলে, উচ্চে নীচে, অন্তরে বাহিরে বাঁশি সর্ব্বত্র হইতে বাজিতে লাগিল—বাঁশি কি বলিতেছে তাহা কেহ বুঝিতে পারিল না, এবং বাঁশির উত্তরে হৃদয় কি বলিতে চাহে তাহাও কেহ স্থির করিতে পারিল না ; কেবল দুটি চক্ষু ভরিয়া অশ্রুজল জাগিয়া উঠিল, এবং একটি অলোকসুন্দর শ্যামস্নিগ্ধ মরণের আকাঙ্ক্ষায় সমস্ত প্রাণ যেন উতলা হইয়া উঠিল।

সভা ভুলিয়া, রাজা ভুলিয়া, আত্মপক্ষ প্রতিপক্ষ ভুলিয়া, যশ অপযশ, জয় পরাজয়, উত্তর প্রত্যুত্তর, সমস্ত ভুলিয়া শেখর আপনার নির্জ্জন হৃদয়কুঞ্জের মধ্যে যেন একলা দাঁড়াইয়া এই বাঁশির গান গাহিয়া গেলেন। কেবল মনে ছিল একটি জ্যোতির্ম্ময়ী

আমসী মূর্ত্তি, কেবল কানে বাজিতেছিল দুটি কমল-চরণের নূপুর-ধ্বনি। কবি যখন গান শেষ করিয়া হতজ্ঞানের মত বসিয়া পড়িলেন, তখন একটি অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যে একটি বৃহৎ ব্যাপ্ত বিরহ ব্যাকুলতায় সভাগৃহ পরিপূর্ণ হইয়া রহিল, কেহ সাধুবাদ দিতে পারিল না।

এই ভাবের প্রবলতার কিঞ্চিৎ উপশম হইলে পুণ্ডরীক সিংহাসন সম্মুখে উঠিলেন। প্রশ্ন করিলেন—রাধাই বা কে, কৃষ্ণই বা কে?—বলিয়া চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং শিষ্যদের প্রতি চাহিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া পুনরায় প্রশ্ন করিলেন "রাধাই বা কে, কৃষ্ণই বা কে?" বলিয়া অসামান্য পাণ্ডিত্য বিস্তার করিয়া আপনিই তাহার উত্তর দিতে আরম্ভ করিলেন। বলিলেন রাধা প্রণব, ওঁকার, কৃষ্ণ ধ্যান যোগ এবং বৃন্দাবন দুই ভ্রূর মধ্যবর্ত্তী বিন্দু। ইড়া, সুষুম্না, পিঙ্গলা, নাভিপদ্ম, হৃৎপদ্ম, ব্রহ্মরন্ধ্র, সমস্ত আনিয়া ফেলিলেন। রা অর্থেই বা কি ধা অর্থেই বা কি, কৃষ্ণ শব্দের ক হইতে মূর্দ্ধণ্য ণ পর্য্যন্ত প্রত্যেক অক্ষরের কত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন অর্থ হইতে পারে তাহার একে একে মীমাংসা করিলেন। একবার বুঝাইলেন কৃষ্ণ যজ্ঞ, রাধিকা অগ্নি, একবার বুঝাইলেন কৃষ্ণ বেদ এবং রাধিকা ষড়দর্শন, তাহার পরে বুঝাইলেন কৃষ্ণ শিক্ষা এবং রাধিকা দীক্ষা। রাধিকা তর্ক, কৃষ্ণ মীমাংসা; রাধিকা উত্তর প্রত্যুত্তর, কৃষ্ণ জয়লাভ। এই বলিয়া রাজার দিকে পণ্ডিতদের দিকে এবং অবশেষে তীব্র হাস্যে শেখরের দিকে চাহিয়া পুণ্ডরীক বসিলেন। রাজা পুণ্ড-রীকের আশ্চর্য্য ক্ষমতায় মুগ্ধ হইয়া গেলেন, পণ্ডিতদের বিস্ময়ের সীমা রহিল না, এবং কৃষ্ণ রাধার নব নব ব্যাখ্যায় বাঁশীর গান, যমুনার কল্লোল, প্রেমের মোহ একেবারে দূর হইয়া গেল;

যেন পৃথিবীর উপর হইতে কে একজন বসন্তের সবুজ রংটুকু মুছিয়া লইয়া আগাগোড়া পবিত্র গোময় লেপন করিয়া গেল। শেখর আপনার এতদিনকার সমস্ত গান বৃথা বোধ করিতে লাগিলেন, ইহার পরে তাঁহার আর গান গাহিবার সামর্থ্য রহিল না। সেদিন সভা ভঙ্গ হইল।

৪।

পরদিন পুণ্ডরীক ব্যস্ত এবং সমস্ত, দ্বিব্যস্ত এবং দ্বিসমস্তক, বৃত্ত, তার্ক্ষ্য, সৌত্র, চক্র, পদ্ম, কাকপদ, আদ্যুত্তর, মধ্যোত্তর, অন্তোত্তর, বাক্যোত্তর, শ্লোকোত্তর, বচনগুপ্ত, মাত্রাচ্যুতক, চ্যুতদত্তাক্ষর, অর্থগূঢ়, স্তুতিনিন্দা, অপহ্নুতি, শুদ্ধাপভ্রংশ, শাব্দী, কালসার, প্রহেলিকা প্রভৃতি অদ্ভুত শব্দচাতুরী দেখাইয়া দিলেন। শুনিয়া সভাসুদ্ধ লোক বিস্ময় রাখিতে স্থান পাইল না। শেখর যে সকল পদ রচনা করিতেন তাহা নিতান্ত সরল—তাহা সুখে দুঃখে উৎসবে আনন্দে সর্ব্বসাধারণে ব্যবহার করিত—আজ তাহারা স্পষ্ট বুঝিতে পারিল তাহাতে কোন গুণপনা নাই, যেন তাহা ইচ্ছা করিলেই তাহারাও রচনা করিতে পারিত, কেবল অনভ্যাস অনিচ্ছা অনবসর ইত্যাদি কারণেই পারে না—নহিলে কথাগুলো বিশেষ নূতনও নহে, দুরূহও নহে, তাহাতে পৃথিবীর লোকের নূতন একটা শিক্ষাও হয় না, সুবিধাও হয় না—কিন্তু আজ যাহা শুনিল তাহা অদ্ভুত ব্যাপার; কাল যাহা শুনিয়াছিল তাহাতেও বিস্তর চিন্তা এবং শিক্ষার বিষয় ছিল। পুণ্ডরীকের পাণ্ডিত্য ও নৈপুণ্যের নিকট তাহাদের আপনার কবিটিকে নিতান্ত বালক ও সামান্য লোক বলিয়া মনে হইতে লাগিল। মৎস্যপুচ্ছের তাড়নায় জলের মধ্যে যে গূঢ় আন্দোলন চলিতে থাকে, সরোবরের পদ্ম যেমন তাহার প্রত্যেক আঘাত

অনুভব করিতে পারে, শেখর তেমনি তাঁহার চতুর্দ্দিকবর্ত্তী সভাস্থজনের মনের ভাব হৃদয়ের মধ্যে বুঝিতে পারিলেন।

আজ শেষদিন। আজ জয় পরাজয় নির্ণয় হইবে। রাজা তাঁহার কবির প্রতি তীব্র দৃষ্টিপাত করিলেন। তাহার অর্থ এই,আজ নিরুত্তর হইয়া থাকিলে চলিবে না—তোমার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে। শেখর শ্রান্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কেবল এই ক'টি কথা বলিলেন—"বীণাপাণি, শ্বেতভুজা, তুমি যদি তোমার কমলবন শূন্য করিয়া আজ মল্লভূমিতে আসিয়া দাঁড়াইলে তবে তোমার চরণাসক্ত যে ভক্তগণ অমৃতপিপাসী, তাহাদের কি গতি হইবে?" মুখ ঈষৎ উপরে তুলিয়া করুণ স্বরে বলিলেন, যেন শ্বেতভুজা বীণাপাণি নতনয়নে রাজান্তঃপুরে জালায়নসম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন।

তখন পুণ্ডরীক উঠিয়া সশব্দে হাস্য করিলেন—এবং "শেখর" শব্দের শেষ দুই অক্ষর গ্রহণ করিয়া অনর্গল শ্লোক রচনা করিয়া গেলেন। বলিলেন, পদ্মবনের সহিত খরের কি সম্পর্ক? এবং সঙ্গীতের বিস্তর চর্চ্চাসত্ত্বেও উক্ত প্রাণী কিরূপ ফল লাভ করিয়াছে? আর সরস্বতীর অধিষ্ঠান ত পুণ্ডরীকেই; মহারাজের অধিকারে তিনি কি অপরাধ করিয়াছিলেন, যে, এদেশে তাঁহাকে খর-বাহন করিয়া অপমান করা হইতেছে?

পণ্ডিতেরা এই প্রত্যুত্তরে উচ্চস্বরে হাসিতে লাগিলেন। সভাসদেরাও তাহাতে যোগ দিল—তাঁহাদের দেখা-দেখি সভাসুদ্ধ সমস্ত লোক—যাহারা বুঝিল এবং না বুঝিল—সকলেই হাসিতে লাগিল। ইহার উপযুক্ত প্রত্যুত্তরের প্রত্যাশায় রাজা তাঁহার কবিসখাকে বারবার অঙ্কুশের ন্যায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টির দ্বারা তাড়না করিতে লাগিলেন। কিন্তু শেখর তাহার প্রতি কিছুমাত্র মনোযোগ না করিয়া অটলভাবে বসিয়া রহিলেন।

তথন রাজা শেথরের প্রতি মনে মনে অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া সিংহাসন হইতে নামিয়া আসিলেন—এবং নিজের কণ্ঠ হইতে মুক্তার মালা খুলিয়া পুণ্ডরীকের গলায় পরাইয়া দিলেন—সভাস্থ সকলেই ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। অন্তঃপুর হইতে এককালে অনেকগুলি বলয় কঙ্কণ নূপুরের শব্দ শুনা গেল—তাহাই শুনিয়া শেথর আসন ছাড়িয়া উঠিলেন এবং ধীরে ধীরে সভাগৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

৫

কৃষ্ণ চতুর্দ্দশীর রাত্রি। ঘন অন্ধকার। ফুলের গন্ধ বহিয়া দক্ষিণের বাতাস উদার বিশ্ববন্ধুর ন্যায় মুক্ত বাতায়ন দিয়া নগরের ঘরে ঘরে প্রবেশ করিতেছে।

ঘরের কাষ্ঠমঞ্চ হইতে শেথর আপনার পুঁথিগুলি পাড়িয়া সম্মুখে স্তূপাকার করিয়া রাখিয়াছেন। তাহার মধ্য হইতে বাছিয়া বাছিয়া নিজের রচিত গ্রন্থগুলি পৃথক্ করিয়া রাখিলেন। অনেকদিনকার অনেক লেখা। তাহার মধ্যে অনেকগুলি রচনা তিনি নিজেই প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিলেন। সেগুলি উল্টাইয়া পাল্টাইয়া এখানে ওখানে পড়িয়া দেখিতে লাগিলেন। আজ তাঁহার কাছে ইহা সমস্তই অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হইল। নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, সমস্ত জীবনের এই কি সঞ্চয়! কতকগুলা কথা এবং ছন্দ এবং মিল! ইহার মধ্যে যে, কোন সৌন্দর্য্য, মানবের কোন চির আনন্দ, কোন বিশ্বসঙ্গীতের প্রতিধ্বনি, তাঁহার আপনার হৃদয়ের কোন গভীর প্রকাশ নিবদ্ধ হইয়া আছে আজ তিনি তাহা দেখিতে পাইলেন না। রোগীর মুখে যেমন কোন খাদ্যই রুচে না, তেমনি আজ তাঁহার হাতের কাছে যাহা কিছু আসিল সমস্তই ঠেলিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়া

দিলেন। রাজার মৈত্রী, লোকের খ্যাতি, হৃদয়ের দুরাশা, কল্পনার কুহক—আজ অন্ধকার রাত্রে সমস্তই শূন্য বিড়ম্বনা বলিয়া ঠেকিতে লাগিল। তখন একটি একটি করিয়া তাঁহার পুঁথি ছিঁড়িয়া সম্মুখের জ্বলন্ত অগ্নিভাণ্ডে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। হঠাৎ একটা উপহাসের কথা মনে উদয় হইল। হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"বড় বড় রাজারা অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া থাকেন—আজ আমার এ কাব্যমেধ যজ্ঞ!" কিন্তু তখনি মনে উদয় হইল, তুলনাটা ঠিক হয় নাই। অশ্বমেধের অশ্ব যখন সর্ব্বত্র বিজয়ী হইয়া ফিরিয়া আসে তখনি অশ্বমেধ হয়—আমার কবিত্ব যে দিন পরাজিত হইয়াছে আমি সেই দিন কাব্যমেধ করিতে বসিয়াছি—আরো বহুদিন পূর্ব্বে করিলেই ভাল হইত।

একে একে নিজের সকল গ্রন্থগুলিই অগ্নিতে সমর্পণ করিলেন। আগুন ধূধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিলে কবি সবেগে দুই শূন্য হস্ত নিক্ষেপ করিতে করিতে বলিলেন—"তোমাকে দিলাম, তোমাকে দিলাম, তোমাকে দিলাম—হে সুন্দরি অগ্নিশিখা, তোমাকেই দিলাম। এতদিন তোমাকেই সমস্ত আহুতি দিয়া আসিতেছিলাম, আজ একেবারে শেষ করিয়া দিলাম। বহুদিন তুমি আমার হৃদয়ের মধ্যে জ্বলিতেছিলে হে মোহিনী বহ্নিরূপিণি! যদি সোণা হইতাম ত উজ্জ্বল হইয়া উঠিতাম—কিন্তু আমি তুচ্ছ তৃণ, দেবি, তাই আজ ভস্ম হইয়া গিয়াছি।"

রাত্রি অনেক হইল। শেখর তাঁহার ঘরের সমস্ত বাতায়ন খুলিয়া দিলেন। তিনি যে যে ফুল ভালবাসিতেন সন্ধ্যাবেলা বাগান হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন। সবগুলি শাদা ফুল, যুঁই, বেল এবং গন্ধরাজ। তাহারই মুঠা মুঠা লইয়া নির্ম্মল বিছানার উপর ছড়াইয়া দিলেন। ঘরের চারিদিকে প্রদীপ

জ্বালাইলেন। তাহার পর মধুর সঙ্গে একটি উদ্ভিদের বিষরস মিশাইয়া নিশ্চিন্তমুখে পান করিলেন—এবং ধীরে ধীরে আপনার শয্যায় গিয়া শয়ন করিলেন। শরীর অবশ এবং নেত্র মুদ্রিত হইয়া আসিল।

নূপুর বাজিল। দক্ষিণের বাতাসের সঙ্গে কেশগুচ্ছের একটা সুগন্ধ ঘরে প্রবেশ করিল। কবি নিমীলিত নেত্রে কহিলেন "দেবি, ভক্তের প্রতি দয়া করিলে কি? এতদিন পরে আজ কি দেখা দিতে আসিলে?" একটি সুমধুর কণ্ঠে উত্তর শুনিলেন "কবি, আসিয়াছি।" শেখর চমকিয়া উঠিয়া চক্ষু মেলিলেন—দেখিলেন শয্যার সম্মুখে এক অপরূপ রমণীমূর্ত্তি। মৃত্যু-সমাচ্ছন্ন বাষ্পাকুলনেত্রে স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাইলেন না। মনে হইল তাঁহার হৃদয়ের সেই ছায়াময়ী প্রতিমা অন্তর হইতে বাহির হইয়া মৃত্যুকালে তাঁহার মুখের দিকে স্থিরনেত্রে চাহিয়া আছে।

রমণী কহিলেন, "আমি রাজকন্যা অপরাজিতা।"

কবি প্রাণপণে উঠিয়া বসিলেন।

রাজকন্যা কহিলেন—"রাজা তোমার সুবিচার করেন নাই। তোমারই জয় হইয়াছে, কবি, তাই আমি আজ তোমাকে জয়-মাল্য দিতে আসিয়াছি।"

বলিয়া অপরাজিতা নিজের কণ্ঠ হইতে স্বহস্তরচিত পুষ্পমালা খুলিয়া কবির গলায় পরাইয়া দিলেন। মরণাহত কবি শয্যার উপরে পড়িয়া গেলেন।

বাঙ্গলার আদিকাব্য।

বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস-লেখকমাত্রেই বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পরেই চৈতন্যদেবের পরবর্ত্তী বৈষ্ণবকবি ও গ্রন্থকারদিগের উল্লেখ করিয়া থাকেন। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস বাঙ্গলা ভাষায় কোন গ্রন্থরচনা করেন নাই; ইহাঁদিগকে গীতরচক কবি বলা যাইতে পারে। বৃন্দাবন দাস প্রণীত চৈতন্যভাগবতকেই অনেকে বঙ্গভাষার আদি কাব্যগ্রন্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ন্যায়রত্ন মহাশয় বলেন, "অনেকে জীব গোস্বামীর করচাকেই বাঙ্গালার আদিগ্রন্থ বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। * * জীব গোস্বামীর করচার পরই বোধ হয় বৃন্দাবন দাস বিরচিত চৈতন্যভাগবত বা চৈতন্যমঙ্গল লিখিত হয়।" বৃন্দাবন দাস চৈতন্যের বর্ত্তমানকালে জন্মিয়াছিলেন, অনেকের মতে জীব গোস্বামী চৈতন্যের মৃত্যুর পরে জন্মগ্রহণ করেন। যাহা হউক, জীব যে বৃন্দাবনদাস অপেক্ষা অন্ততঃ ২০।২৫ বৎসর পরসাময়িক তাহা নিশ্চয়। সুতরাং বৃন্দাবনদাসকেই উক্ত সম্মানে সম্মানিত করা অধিকতর যুক্তিযুক্ত। কিন্তু আমাদের মতে ইহাঁরা কেহই সে সম্মানলাভের অধিকারী নহেন।

চৈতন্যদেবের জন্মের ১২ বৎসর পূর্ব্বে ১৩৯৫ শকে গুণরাজ খাঁন উপাধিযুক্ত মালাধর বসু "শ্রীকৃষ্ণবিজয়" কাব্য রচনা করিতে আরম্ভ করিয়া ১৪০২ শকে তাহা সমাপ্ত করিয়াছিলেন।* ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে, নরসিংহ দেবের রাজত্বকালে

---

* "তেরশ পঁচানই শকে গ্রন্থ আরম্ভন।
চতুর্দ্দশ দুই শকে হৈল সমাপন॥"
শ্রীকৃষ্ণবিজয়।

১৩৯৫ হইতে ১৪০১ শকাব্দ মধ্যে বিদ্যাপতি দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী লিখিয়াছিলেন। সুতরাং বিদ্যাপতির সমকালেই শ্রীকৃষ্ণবিজয় রচিত হইয়াছিল। উক্ত গ্রন্থকেই নিঃসংশয়ে বাঙ্গলাভাষার আদিকাব্য বলা যাইতে পারে। মালাধর বসু বিদ্যাপতির সমকালে এই কাব্য রচনা করিলেও, তিনি বিদ্যাপতি অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন বোধ হয়। মালাধরের পুত্র সত্যরাজ ও তৎপুত্র রামানন্দ বসু চৈতন্যের সহচর ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যের শ্রেষ্ঠতা ও প্রামাণিকতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। কুলীন গ্রামবাসী বৈষ্ণবগণের প্রশংসাস্থলে চৈতন্যদেব বলিয়াছেন,—

> "কুলীনগ্রামীরে কহে সম্মান করিয়া।
> প্রত্যব্দ আসিবে যাত্রায় পট্টডোর লঞা॥
> গুণরাজ খাঁন কৈল শ্রীকৃষ্ণবিজয়।
> তাহে একবাক্য তাঁর আছে প্রেমময়॥
> নন্দনন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ।
> এই বাক্যে বিকাইনু তাহার বংশের হাত॥"
>
> চৈতন্যচরিতামৃত। মধ্যখণ্ড।

শ্রীকৃষ্ণবিজয় শ্রীমদ্ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্দের বাঙ্গলা অনুবাদ। গ্রন্থখানি পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে নিবদ্ধ এবং প্রত্যেক পরিচ্ছেদের উপরে মেঘমল্লার, মল্লার, রামকেলি ইত্যাদি রাগ রাগিণীর নাম লিখিত থাকায় অনুমান হয় যে, এই কাব্য চামর মন্দিরা বা অন্য কোন সঙ্গীতযন্ত্রের সাহায্যে রাগরাগিণী সহযোগে গীত হইত। এই কাব্যখানি এতদিন হস্তলিখিত পুঁথির আকারে জীর্ণাবস্থায় ছিল, "সজ্জনতোষণী" সম্পাদক বাবু কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের যত্নে ১২৯২ সালে ইহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের

সময়ে এদেশের ভাষা যে হিন্দীসংস্রবশূন্য বাঙ্গলা ভাষা ছিল, এই গ্রন্থ পাঠে তাহা জানিতে পারা যায়। "শ্রীকৃষ্ণবিজয় গ্রন্থের রচনা অতিশয় সরল, এমন কি বঙ্গীয় অর্দ্ধশিক্ষিতা রমণীগণ ও সামান্য বর্ণজ্ঞানবিশিষ্ট নিম্নশ্রেণীর পুরুষগণ এই গ্রন্থ অনায়াসে পড়িতে ও বুঝিতে পারেন। এই গ্রন্থের ভাষা অলঙ্কৃত নয়। ইহার পদ্য অনেক স্থানেই সুমিষ্ট হয় নাই। চৌদ্দ অক্ষরের পয়ারের অনেক স্থলে যোল সতর অক্ষর বা বার তের অক্ষর দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার অনেক শব্দই তাৎকালিক ব্যবহৃত শব্দ। সে সকল শব্দের অর্থ নিতান্ত রাঢ়ীয় লোক ব্যতীত বুঝিতে পারে না। ইহাতে যতই দোষ থাকুক, বিলাতী লোকেরা যেরূপ চসারকে মান্য করেন, আমরা কাব্য সম্বন্ধে ইহাকে তদ্রূপ মান্য করি।" (শ্রীকৃষ্ণবিজয়—উপক্রমণিকা) এই কাব্যের ভাষা কিরূপ প্রাঞ্জল ও তৎকালোচিত বিশুদ্ধ বাঙ্গলা তাহার নিদর্শনস্বরূপে নিয়ে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করা গেল।

"নানা বর্ণে সম্পূর্ণ সেই বৃন্দাবন।
গোপী লয়ে ক্রীড়া করিবারে হৈল মন॥
শারদ পূর্ণিমা শশী করিল উদয়ে।
সুগন্ধি শীতল বায়ু মনোহর বহে॥
কোকিলের কলরব ভ্রমর ঝঙ্কার।
কুসুমিত দশদিক বসন্ত অবতার।
নবকিশলয় বৃক্ষ শোভে বৃন্দাবনে।
অধিক বাড়িল দিবি চন্দ্রের কিরণে॥
কাম অবতার করি বংশীতে নাদ দিল।
শুনিয়া গোকুল নারী মূর্চ্ছিত হইল॥
জানিল গোবিন্দবংশী রায় বৃন্দাবনে।
চলিল সকল নারী একচিত্ত মনে॥"

এক্ষণে অনেকে বঙ্গভাষায় আদিকাব্য-রচয়িতা এই অপরিচিত কবির পরিচয় জিজ্ঞাসা করিবেন। ইতিহাসজ্ঞমাত্রেই অবগত আছেন, আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে পাঁচজন যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন, তাঁহাদের সমভিব্যাহারে পাঁচজন কায়স্থও আসিয়াছিলেন। তন্মধ্যে দশরথ বসু নামক এক ব্যক্তি বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিলেন। এই কাব্যপ্রণেতা মালাধর বসু উক্ত দশরথ বসুর অধস্তন ত্রয়োদশ পর্য্যায়ে উৎপন্ন হন। ইনি রাঢ়ির কায়স্থকুলসম্ভূত ভগীরথ বসুর পুত্র, বর্দ্ধমান প্রদেশস্থ কুলীনগ্রাম ইহাঁর জন্মভূমি। কুলীনগ্রামে মালাধর বসুর বংশধরেরা অদ্যাপি বাস করিতেছেন। গৌড়েশ্বর ইহাঁকে "গুণরাজখাঁন" উপাধি দিয়াছিলেন, এইজন্য "গুণরাজখাঁন" নামেই ইনি সাধারণতঃ পরিচিত হইয়া থাকেন।

যাত্রা-সমাপন।

(য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি।)

২৬ অক্টোবর। জাহাজের একটা দিন বর্ণনা করা যাক্।

সকালে ডেক্ ধুয়ে গেছে, এখনো ভিজে রয়েছে। দুইধারে ডেক্-চেয়ার বিশৃঙ্খলভাবে পরস্পরের উপর রাশীকৃত। খালিপায়ে রাত-কাপড় পরা পুরুষগণ কেউবা বন্ধুসঙ্গে কেউবা একলা মধ্যপথ দিয়ে হুহু করে' বেড়াচ্চে। ক্রমে যখন আটটা বাজ্‌ল এবং একটি আধটি করে' মেয়ে উপরে উঠ্‌তে লাগ্‌ল তখন একে একে এই বিরলবেশ পুরুষদের অন্তর্ধান।

স্নানের ঘরের সম্মুখে বিষম ভিড়। তিনটি মাত্র স্নানাগার

আমরা অনেকগুলি দ্বারস্থ। তোয়ালে এবং স্পঞ্জ হাতে দ্বারমোচনের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি। দশ মিনিটের অধিক স্নানের ঘর অধিকার করবার নিয়ম নেই।

স্নান এবং বেশভূষা সমাপনের পর উপরে গিয়ে দেখা যায় ডেকের উপর পদচারণশীল প্রভাতবায়ুসেবী অনেকগুলি স্ত্রী-পুরুষের সমাগম হয়েচে। ঘন ঘন টুপি উদ্ঘাটন করে' মহিলাদের এবং শিরঃকম্পে পরিচিত বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে শুভপ্রভাত অভিবাদন পূর্ব্বক শীত গ্রীষ্মের তারতম্য সম্বন্ধে পরস্পরের মতামত ব্যক্ত করা গেল।

নটার ঘণ্টা বাজ্‌ল। ব্রেক্‌ফাষ্ট প্রস্তুত। বুভুক্ষু নরনারীগণ সোপানপথ দিয়ে নিম্নকক্ষে ভোজনবিবরে প্রবেশ করলে। ডেকের উপরে আর জনপ্রাণী অবশিষ্ট রইল না। কেবল সারি-সারি শূন্যহৃদয় চৌকি ঊর্দ্ধমুখে প্রভুদের জন্যে অপেক্ষা করে' রইল।

ভোজনশালা প্রকাণ্ডঘর। মাঝে দুইসার লম্বা টেবিল, এবং তার দুইপার্শ্বে খণ্ড খণ্ড ছোট ছোট টেবিল। আমরা দক্ষিণ পার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র টেবিল অধিকার করে' সাতটি প্রাণী দিনের মধ্যে তিনবার ক্ষুধা নিবৃত্তি করে' থাকি। মাংস রুটি ফলমূল মিষ্টান্ন মদিরায় এবং হাস্যকৌতুক গল্পগুজবে এই অনতিউচ্চ সুপ্রশস্ত ঘর কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠে।

আহারের পর উপরে গিয়ে যে যার নিজ নিজ চৌকি অন্বেষণ এবং যথাস্থানে স্থাপনে ব্যস্ত। চৌকি খুঁজে পাওয়া দায়। ডেক্ ধোবার সময় কার চৌকি কোথায় ফেলেচে তার ঠিক নেই।

তারপর চৌকি খুঁজে নিয়ে আপনার জায়গাটুকু গুছিয়ে নেওয়া বিষম ব্যাপার। যেখানে একটু কোণ, যেখানে একটু

বাতাস, যেখানে একটু রৌদ্রের তেজ কম, যেখানে যার অভ্যাস সেইখানে ঠেলেঠুলে টেনেটুনে পাশ কাটিয়ে পথ করে' আপনার চৌকিটি রাখতে পারলে সমস্ত দিনের মত নিশ্চিন্ত।

তারপরে দেখা যায় কোন চৌকিহারা ম্লানমুখী রমণী কাতরভাবে ইতস্তত দৃষ্টিপাত করচে, কিম্বা কোন বিপদ্‌গ্রস্ত অবলা এই চৌকি-অরণ্যের মধ্যে থেকে নিজেরটি বিশ্লিষ্ট করে' নিয়ে অভিপ্রেত স্থানে স্থাপন করতে পারচে না—তখন আমরা পুরুষগণ নারীসহায়ব্রতে চৌকিউদ্ধারকার্য্যে নিযুক্ত হয়ে সুশিষ্ট ও সুমিষ্ট ধন্যবাদ অর্জ্জন করে' থাকি।

তার পরে যে যার চৌকি অধিকার করে' বসে' যাওয়া যায়। ধূম্রসেবীগণ, হয় ধূম্রকক্ষে নয় ডেকের পশ্চাদ্ভাগে সমবেত হয়ে পরিতৃপ্ত মনে ধূমপান করচে। মেয়েরা অর্দ্ধনিলীন অবস্থায় কেউবা নবেল পড়চে, কেউবা শেলাই করচে; মাঝে মাঝে দুই একজন যুবক ক্ষণেকের জন্যে পাশে বসে' মধুকরের মত কানের কাছে গুন্ গুন্ করে' আবার চলে যাচ্চে।

আহার কিঞ্চিৎ পরিপাক হবামাত্র এক দলের মধ্যে কয়ট্‌স্ খেলা আরম্ভ হল। দুই বালতি পরস্পর হতে হাত দশেক দূরে স্থাপিত হল। দুই যুড়ি স্ত্রীপুরুষ বিরোধী পক্ষ অবলম্বন করে' পালাক্রমে স্বস্ব স্থান থেকে কল্‌সীর বিড়ের মত কতকগুলি রজ্জুচক্র বিপরীত বাল্‌তির মধ্যে ফেলবার চেষ্টা করতে লাগ্‌ল। যে পক্ষ সর্ব্বাগ্রে একুশ করতে পারবে তারই জিত। মেয়ে খেলোয়াড়েরা কখনো জয়োচ্ছ্বাসে কখনো নৈরাশ্যে উর্দ্ধকণ্ঠে চীৎকার করে' উঠ্‌চেন। কেউবা দাঁড়িয়ে দেখ্‌চে, কেউবা গণনা করচে, কেউবা খেলায় যোগ দিচ্চে, কেউবা আপন আপন পড়ায় কিম্বা গল্পে নিবিষ্ট হয়ে আছে।

একটার সময় আবার ঘণ্টা। আবার আহার। আহারান্তে উপরে ফিরে এসে দুইস্তর খাদ্যের ভারে এবং মধ্যাহ্নের উত্তাপে আলস্য অত্যন্ত ঘনীভূত হয়ে আসে। সমুদ্র প্রশান্ত, আকাশ সুনীল মেঘমুক্ত, অল্প অল্প বাতাস দিচ্চে। কেদারায় হেলান্ দিয়ে নীরবে নভেল পড়তে পড়তে অধিকাংশ নীলনয়নে নিদ্রাবেশ হয়ে আস্‌চে। কেবল দুই একজন দাবা, ব্যাক্‌গ্যামন্‌, কিম্বা ড্রাফ্‌ট্‌ খেল্‌চে, এবং দুই একজন অশ্রান্ত অধ্যবসায়ী যুবক সমস্ত দিনই কয়ট্‌স্‌ খেলায় নিযুক্ত। কোন রমণী কোলের উপর কাগজ কলম নিয়ে একাগ্রমনে চিঠি লিখ্‌চে, এবং কোন শিল্পকুশলা কৌতুকপ্রিয়া যুবতী নিদ্রিত সহযাত্রীর ছবি আঁক্‌তে চেষ্টা করচে।

ক্রমে রৌদ্রের প্রখরতা হ্রাস হয়ে এল। তখন তাপক্লিষ্ট ক্লান্তকায়গণ নীচে নেমে গিয়ে রুটিমাখনমিষ্টান্ন সহযোগে চা-রস পান করে' শরীরের জড়তা পরিহারপূর্ব্বক পুনর্ব্বার ডেকে উপস্থিত। পুনর্ব্বার যুগল মূর্ত্তির সোৎসাহ পদচারণা এবং মৃদুমন্দ হাস্যালাপ আরম্ভ হল। কেবল দু'চার জন পাঠিকা উপন্যাসের শেষ পরিচ্ছেদ থেকে কিছুতেই আপনাকে বিচ্ছিন্ন করতে পারচে না,—দিবাবসানের ম্লান ক্ষীণালোকে একাগ্রনিবিষ্ট দৃষ্টিতে নায়ক নায়িকার পরিণাম অনুসরণ করচে।

দক্ষিণে জলন্ত কনকাকাশ এবং অগ্নিবর্ণ জলরাশির মধ্যে সূর্য্য অস্ত গেল এবং বামে সূর্য্যাস্তের কিছু পূর্ব্বে হতেই চন্দ্রোদয় হয়েচে। জাহাজ থেকে পূর্ব্বদিগন্ত পর্য্যন্ত বরাবর জ্যোৎস্নারেখা ঝিক্ ঝিক্ করচে। পূর্ণিমার সন্ধ্যা নীল সমুদ্রের উপর আপনার শুভ্র অঙ্গুলি স্থাপন করে' আমাদের সেই জ্যোৎস্নাপুলকিত পূর্ব্ব ভারতবর্ষের পথ নির্দ্দেশ করে' দিচ্চে।

জাহাজের ডেকের উপরে এবং কক্ষে কক্ষে বিদ্যুদ্দীপ জ্বলে' উঠ্‌ল। ছটার সময় ডিনারের প্রথম ঘণ্টা বাজ্‌ল। বেশ পরিবর্ত্তন উপলক্ষে সকলে স্বস্ব কক্ষে প্রবেশ করলে। আধঘণ্টা পরে দ্বিতীয় ঘণ্টা বাজ্‌ল। ভোজনগৃহে প্রবেশ করা গেল। সারিসারি নরনারী বসে' গেছে। কারো বা কালো কাপড়, কারো রঙীন কাপড়, কারো বা শুভ্রবক্ষ অর্দ্ধ-অনাবৃত। মাথার উপরে শ্রেণীবদ্ধ বিদ্যুৎ-আলোক জ্বল্‌চে। গুন্‌গুন্‌ আলাপের সঙ্গে কাঁটাচামচের টুং টাং ঠুং ঠুং শব্দ উঠ্‌চে, এবং বিচিত্র খাদ্যের পর্য্যায় পরিচারকদের হাতে হাতে নিঃশব্দ স্রোতের মত যাতায়াত করচে।

আহারের পর ডেকে গিয়ে শীতল বায়ু সেবন। কোথাও বা যুবকযুবতী অন্ধকার কোণের মধ্যে চৌকি টেনে নিয়ে গিয়ে গুন্‌গুন্‌ করচে, কোথাওবা দু'জনে জাহাজের বারান্দা ধরে' ঝুঁকে পড়ে' রহস্যালাপে নিমগ্ন, কোন কোন যুড়ি গল্প করতে করতে ডেকের আলোক ও অন্ধকারের মধ্য দিয়ে দ্রুতপদে একবার দেখা দিচ্চে একবার অদৃশ্য হয়ে যাচ্চে, কোথাওবা একধারে পাঁচসাত জন স্ত্রীপুরুষ এবং জাহাজের কর্ম্মচারী জটলা করে' উচ্চহাস্যে প্রমোদকল্লোল উচ্ছ্বসিত করে' তুল্‌চে। অলস পুরুষরা কেউবা বসে' কেউবা দাঁড়িয়ে কেউবা অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় চুরট খাচ্চে, কেউবা স্মোকিং সেলুনে কেউবা নীচে খাবার ঘরে হুইস্কি-সোডা পাশে রেখে চার জনে দল বেঁধে বাজি রেখে তাস খেলচে। ওদিকে সঙ্গীতশালায় সঙ্গীতপ্রিয় দু'চার জনের সমাবেশ হয়ে গান বাজনা এবং মাঝে মাঝে করতালি শোনা যাচ্চে।

ক্রমে সাড়ে দশটা বাজে,—মেয়েরা নেবে যায়,—ডেকের

উপরে আলো হঠাৎ নিবে যায়,—ডেক্ নিঃশব্দ নির্জ্জন অন্ধকার হয়ে আসে, এবং চারিদিকে নিশীথের নিস্তব্ধতা, চন্দ্রালোক এবং অনন্ত সমুদ্রের অশ্রান্ত কলধ্বনি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

২৭ অক্টোবর। লোহিত সমুদ্রের গরম ক্রমেই বেড়ে উঠ্‌চে। ডেকের উপর মেয়েরা সমস্ত দিন তৃষাতুরা হরিণীর মত ক্লিষ্ট কাতর হয়ে রয়েচে। তারা কেবল অতি ক্লান্তভাবে পাথা নাড়চে, স্মেলিং সল্ট্ শুঁকচে, এবং সকরুণ যুবকেরা যখন পাশে এসে কুশল জিজ্ঞাসা করচে তখন নিমীলিতপ্রায় নেত্রপল্লব ঈষৎ উন্মীলন করে' ম্লানহাস্যে কেবল গ্রীবাভঙ্গী দ্বারা আপন সুকুমার দেহলতার একান্ত অবসন্নতা ইঙ্গিতে জানাচ্চে। যতই পরিপূর্ণ করে' টিফিন্ এবং লেবুর সরবৎ খাচ্চে, ততই জড়ত্ব এবং ক্লান্তি বাড়চে, নেত্র নিদ্রানত ও সর্ব্বশরীর শিথিল হয়ে আস্‌চে।

২৮ অক্টোবর। আজ এডেনে পৌঁছন গেল।

২৯ অক্টোবর। আমাদের জাহাজে একটি পার্সী সহযাত্রী আছে। তার ছুঁচোলো ছাঁটা দাড়ি এবং বড় বড় চোখ সর্ব্বপ্রথমেই চোখে পড়ে। অল্প বয়স। নয় মাস য়ুরোপে বেড়িয়ে বিলিতী পোষাক এবং চালচলন ধরেচে। বলে, ইণ্ডিয়া লাইক্ করে না। বলে, তার য়ুরোপীয় বন্ধুদের (অধিকাংশই স্ত্রীবন্ধু) কাছ থেকে তিনশো চিঠি এসে তার কাছে জমেছে, তাই নিয়ে বেচারা মহামুস্কিলে পড়েচে, কখনই বা পড়বে কখনই বা জবাব দেবে! লোকটা আবার নিজে বন্ধুত্ব করতে বড়ই নারাজ, কিন্তু বিধাতার বিড়ম্বনায় বন্ধুত্ব তার মাথার উপরে অনাহূত অযাচিত বর্ষিত হতে থাকে। সে বলে বন্ধুত্ব করে' কোন "ফন্" নেই! উপরন্তু কেবল ল্যাঠা! এমন কি শত শত জর্ম্মান ফরাসী ইটালিয়ান এবং ইংরেজ মেয়ের সঙ্গে সে "ফ্লার্ট্" করে' এসেচে

কিন্তু তাতে কোন মজা পায়নি! একটা মেয়েকে কতকগুলো মিথ্যে কথা বলা যায়, সে আদর করে' পাথার বাড়ি মারে এই ত ফ্লার্টেশন, এতে "ফন্" নেই! লোকটা পৃথিবীতে কিছুতেই যথেষ্ট মজা পাচ্চে না; কিন্তু তার কাছ থেকে অন্য লোকে যে মজা উপভোগ করচে তা বোধ হয় সে স্বপ্নেও জানে না।

২ নবেম্বর। ভারতবর্ষের কাছাকাছি আসা গেছে। কাল বোম্বাই পৌঁছবার কথা।

আজ সুন্দর সকালবেলা। ঠাণ্ডা বাতাস বচ্চে—সমুদ্র সফেন তরঙ্গে নৃত্য করচে, উজ্জল রৌদ্র উঠেচে; কেউ কয়ট্‌স্ খেল্‌চে, কেউ নবেল পড়চে, কেউ গল্প করচে; মুজিক সেলূনে গান চল্‌চে, স্মোকিং সেলূনে তাস্ চল্‌চে, ডাইনিং সেলূনে খানার আয়োজন হচ্চে, এবং একটি সঙ্কীর্ণ ক্যাবিনের মধ্যে আমাদের একটি বৃদ্ধ সহযাত্রী মরচে।

সন্ধ্যা আটটার সময় ডিলন্ সাহেবের মৃত্যু হল। আজ সন্ধ্যার সময় একটি নাটক অভিনয় হবার কথা ছিল।

৩ নবেম্বর। সকালে অন্ত্যেষ্টি অনুষ্ঠানের পর ডিলনের মৃতদেহ সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হল। আজ আমাদের সমুদ্রযাত্রার শেষ দিন।

অনেক রাত্রে জাহাজ বোম্বাইবন্দরে পৌঁছল।

৪ নবেম্বর। জাহাজ ত্যাগ করে' ভারতবর্ষে নেমে এখন আমার অদৃষ্টের সঙ্গে আর কোন মনান্তর নেই। সংসারটা মোটের উপরে বেশ আনন্দের স্থান বোধ হচ্চে। কেবল একটা গোল বেধেছিল—টাকাকড়িসমেত আমার ব্যাগটি জাহাজের ক্যাবিনে ফেলে এসেছিলুম, তাতে করে' সংসারের আকৃতির হঠাৎ অনেকটা পরিবর্ত্তন হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু হোটেল থেকে

অবিলম্বে জাহাজে ফিরে গিয়ে সেটি সংগ্রহ করে' এনেছি। এই ব্যাগ্ ভুলে যাবার সম্ভাবনা কাল চকিতের মত একবার মনে উদয় হয়েছিল। মনকে তখনি সাবধান করে' দিলুম ব্যাগটি যেন না ভোলা হয়। মন বল্লে, ক্ষেপেছ! আমাকে তেমনি লোক পেয়েছ!—আজ সকালে তাকে বিলক্ষণ এক চোট ভৎর্সনা করেচি—সে নতমুখে নিরুত্তর হয়ে রইল। তার পর যখন ব্যাগ ফিরে পাওয়া গেল তখন আবার তার পিঠে হাত বুলতে বুলতে হোটেলে ফিরে এসে স্নান করে' বড় আরাম বোধ হচ্চে! এই ঘটনা নিয়ে আমার স্বাভাবিক বুদ্ধির প্রতি কটাক্ষপাত করে' পরিহাস করবেন সৌভাগ্যক্রমে এমন প্রিয়বন্ধু কেউ উপস্থিত নেই। সুতরাং রাত্রে যখন কলিকাতামুখী গাড়িতে চড়ে' বসা গেল, তখন যদিও আমার বালিশটা ভ্রমক্রমে হোটেলে ফেলে এসেছিলুম তবু আমার সুখনিদ্রার বিশেষ ব্যাঘাত হয় নি।

স্বরবর্ণ 'এ'।

বাঙ্গলায় 'এ' স্বরবর্ণ আদ্যক্ষরস্বরূপে ব্যবহার হইলে তাহার দুইপ্রকার উচ্চারণ দেখা যায়। একটি বিশুদ্ধ এ, আর একটি অ্যা। 'এক' এবং 'একুশ' শব্দে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

একারের বিকৃত উচ্চারণ বাঙ্গলায় অধিকাংশ স্থলেই দেখা যায়, কেবল এসম্বন্ধে একটি পাকা নিয়ম খুব দৃঢ় করিয়া বলা যায়।—পরে ইকার অথবা উকার থাকিলে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী একারের কখনই বিকৃতি হয় না। 'জ্যেঠা' এবং 'জ্যেঠী' 'বেটা' এবং 'বেটী' 'একা' এবং 'এক্‌টু' তুলনা করিয়া দেখিলে ইহার প্রমাণ

হইবে। এ নিয়মের একটিও ব্যতিক্রম আছে বলিয়া জানা যায় নাই।

কিন্তু একারের বিকার কোথায় হইবে তাহার একটা নিশ্চিত নিয়ম বাহির করা এমন সহজ নহে—অনেকস্থলে দেখা যায় অবিকল একইরূপ প্রয়োগে 'এ' কোথাও বা বিকৃত কোথাও বা অবিকৃত ভাবে আছে। যথা 'তেলা' (তৈলাক্ত) এবং 'বেলা' (সময়)।

প্রথমে দেখা যাক্, পরে অকারান্ত অথবা বিসর্গ শব্দ থাকিলে পূর্ব্ববর্ত্তী একারের কিরূপ অবস্থা হয়।

অধিকাংশ স্থলেই কোন পরিবর্ত্তন হয় না। যথা কেশ বেশ পেট হেঁট বেল তেল তেজ শেজ খেদ বেদ প্রেম হেম ইত্যাদি।

কিন্তু দন্ত্য 'ন'য়ের পূর্ব্বে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। যথা ফেন (ভাতের), সেন (পদবী), কেন, যেন, হেন। মূর্দ্ধণ্য 'ণ'য়ের পূর্ব্বেও সম্ভবতঃ এই নিয়ম খাটে কিন্তু প্রচলিত বাঙ্গলায় তাহার কোন উদাহরণ পাওয়া যায় না। একটা কেবল উল্লেখ করি, কেহ কেহ "দিন-ক্ষণ'কে 'দিন-ক্ষ্যাণ' বলিয়া থাকেন। এইখানে পাঠকদিগকে বলিয়া রাখি 'ন' অক্ষর যে কেবল একারকে আক্রমণ করে তাহা নহে অকারের প্রতিও তাহার বক্রদৃষ্টি আছে—বন, মন, ধন, জন প্রভৃতি শব্দের প্রচলিত উচ্চারণ প্রণিধান করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে উক্ত শব্দগুলিতে আদ্য-স্বরযুক্ত অকারের বিকৃতি ঘটিয়াছে। বট, মঠ, জল প্রভৃতি শব্দের প্রথমাক্ষরের সহিত তুলনা করিলে আমার কথা স্পষ্ট হইবে।

আমার বিশ্বাস, পরবর্ত্তী 'চ' অক্ষরও এইরূপ বিকারজনক। কিন্তু কথা বড় বেশি পাওয়া যায় না। একটা কথা আছে—

প্যাচ্। কিন্তু সেটা যে 'পেঁচ' শব্দ হইতে রূপান্তরিত হইয়াছে এমন অনুমান করিবার কোন কারণ নাই। আর একটা বলা যায়, ট্যাঁচ্। 'ট্যাঁচ্' করিয়া দেওয়া। এ শব্দ সম্বন্ধেও পূর্ব্বকথা খাটে। অতএব এটাকে নিয়ম বলিয়া মানিতে পারি না। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গবাসী পাঠকেরা কাল্পনিক শব্দবিন্যাস দ্বারা চেষ্টা করিয়া দেখিবেন চয়ের পূর্ব্বে বিশুদ্ধ একার উচ্চারণ জিহ্বার পক্ষে কেমন সহজ বোধ হয় না। এইখানে বলা আবশ্যক আমি দুই অক্ষরের কথা লইয়া আলোচনা করিতেছি।

পূর্ব্বনিয়মের দুটো একটা ব্যতিক্রম আছে। কোন পাঠক যদি তাহার কারণ বাহির করিতে পারেন ত বাধিত হইব। এদিকে 'ভেক' উচ্চারণে কোন গোলযোগ নাই, অথচ 'এক' শব্দ উচ্চারণে 'এ' স্বর বিকৃত হইয়াছে। আর একটা ব্যতিক্রম 'লেজ' (লাঙ্গুল)। 'তেজ' শব্দের একার বিশুদ্ধ, 'লেজ' শব্দের একার বিকৃত।

বাঙ্গলায় দুই শ্রেণীর শব্দ-দ্বিগুণীকরণ প্রথা প্রচলিত আছে।

১। বিশেষণ ও অসমাপিকা ক্রিয়াপদ। যথা, বড়-বড়, ছোট-ছোট, বাঁকাবাঁকা, নেচে-নেচে, গেয়ে-গেয়ে, হেসে-হেসে ইত্যাদি।

২। শব্দানুকরণমূলক বর্ণনাসূচক ক্রিয়ার বিশেষণ। যথা প্যাট্‌প্যাট, টাঁটাঁ, খিট্‌খিট্ ইত্যাদি।

এই দ্বিতীয় শ্রেণীর দ্বিগুণীকরণের স্থলে পাঠক কুত্রাপিও আদ্যাক্ষরে একার সংযোগ দেখিতে পাইবেন না। গাঁগাঁ, গোঁ-গোঁ, চাঁচাঁ, চ্যাচ্যাঁ, টুক্‌টুক্ পাইবেন, কিন্তু গেঁগেঁ চেঁচেঁ কোথাও নাই। কেবল নিতান্ত যেখানে শব্দের অবিকল অনুকরণ সেইখানেই দৈবাৎ একারের সংশ্রব পাওয়া যায়, যথা

ঘেউঘেউ। এরূপ স্থলে অ্যাকারের প্রাচুর্ভাবটাই কিছু বেশি—যথা, ক্যাঁস্‌ফ্যাঁস্‌, খ্যাঁকখ্যাঁক্‌, স্যাঁৎস্যাঁৎ, ম্যাড়ম্যাড়।

এই শব্দগুলিকে বিশেষণে পরিণত করিলে দ্বিতীয়ার্দ্ধের প্রথমে অ্যাকারের পরিবর্ত্তে একার সংযুক্ত হয়; যথা, স্যাঁৎসেঁতে, ম্যাড়্‌মেড়ে। তাহার কারণ পূর্ব্বেই আভাস দিয়াছি। স্যাঁৎ-সেঁতিয়া হইতে স্যাঁৎসেঁতে হইয়াছে। বলা হইয়াছে ইকারের পূর্ব্বে এ উচ্চারণ বলবান থাকে।

ক্রিয়াপদজাত বিশেষ্য শব্দের একারের উচ্চারণসম্বন্ধে একটি বিশেষ নিয়ম সন্ধান করা আবশ্যক। দৃষ্টান্তস্বরূপে দেখ 'খেলা' এবং 'গেলা' (গলাধঃকরণ) ইহাদের প্রথমাক্ষরবর্ত্তী একারের উচ্চারণভেদ দেখা যায়। প্রথমটি খ্যালা, দ্বিতীয়টি গেলা।

আমি স্থির করিলাম—সংস্কৃত মূল শব্দের ইকারের অপভ্রংশে বাঙ্গালার যেথানে 'এ' হয় সেথানে বিশুদ্ধ 'এ' উচ্চারণ থাকে। খেলন হইতে খেলা, কিন্তু গিলন হইতে গেলা—এই জন্য শেষোক্ত এ অবিকৃত আছে। ইহার পোষক আরো অনেক-গুলি প্রমাণ পাওয়া গেল। যেমন মিলন হইতে মেলা (মিলিত হওয়া), মিশ্রণ হইতে মেশা, চিহ্ন হইতে চেনা, ইত্যাদি।

ইহার প্রথম ব্যতিক্রম দেখিলাম, বিক্রয় হইতে বেচা (ব্যাচ্যা), সিঞ্চন হইতে সেঁচা (স্যাঁচা), চীৎকার হইতে চেঁচানো (চ্যাঁচানো)।

তখন আমার পূর্ব্বসন্দেহ দৃঢ় হইল যে, 'চ' অক্ষরের পূর্ব্বে একার উচ্চারণের বিকার ঘটে। এই জন্যই চয়ের পূর্ব্বে আমার এই শেষ নিয়মটি খাটিল না।

যাহা হউক্‌, যদি এই শ্রেণীর শব্দ সম্বন্ধে একটা সর্ব্বব্যাপী নিয়ম করিতে হয় তবে এরূপ বলা যাইতে পারে—যে সকল

অসমাপিকা ক্রিয়ার আদ্যাক্ষরে ই সংযুক্ত থাকে, বিশেষ্য রূপ ধারণকালে তাহাদের সেই ইকার একারে বিকৃত হইবে, এবং অসমাপিকরূপে যে সকল ক্রিয়ার আদ্যক্ষরে এ সংযুক্ত থাকে, বিশেষ্যরূপে তাহাদের সেই একার অ্যাকারে পরিণত হইবে।

যথা—

অসমাপিকা ক্রিয়ারূপে—	বিশেষ্য রূপে।
কিনিয়া।	কেনা।
বেচিয়া।	ব্যাচা।
মিলিয়া।	মেলা।
ঠেলিয়া।	ঠ্যালা।
লিখিয়া।	লেখা।
দেখিয়া।	দ্যাখা।
হেলিয়া।	হ্যালা।
গিলিয়া।	গেলা।

এ নিয়মের কোথাও ব্যতিক্রম পাওয়া যাইবে না।

মোটের উপর ইহা বলা যায় যে, এ হইতে একেবারে আ উচ্চারণে যাওয়া রসনার পক্ষে কিঞ্চিৎ আয়াসসাধ্য, আ হইতে এ উচ্চারণে গড়াইয়া পড়া সহজ। এই জন্য আমাদের অঞ্চলে আকারের পূর্ব্ববর্ত্তী একার প্রায়ই "অ্যা" নামক সন্ধিস্বরকে আপন আসন ছাড়িয়া দিয়া রসনার শ্রমলাঘব করে।

এই উচ্চারণের নিয়ম সম্বন্ধে পাঠকদিগের যদি কোন বক্তব্য থাকে লিখিয়া পাঠাইলে সুখী হইব।

তুমি।

সংসার তোমায় দিল অন্তিম বিদায়
তবু তুমি ঘুরে মর সংসার মায়ায়!
এত প্রেম, এত স্নেহ, প্রিয়জন-গেহ
নারিলে ভুলিতে ; তাই ছাড়ি তব দেহ
আসিয়াছ জীবনের পরপার হ'তে।
ভালবাসো যারে, তার নয়নের পরে
স্বপ্নসম ঘিরে থাক, না দাও ধরিতে।
পরশের তরে যবে চিত্ত কেঁদে মরে
চোখে বহে নীর, প্রাণ চাহেগো মরিতে,
শূন্য হ'তে শুনি তব আশ্বাস-বচন।
তাই এ হৃদয়ে সদা আশা জেগে রয়
তোমায় আমায় পুন হইবে মিলন ;
যে প্রেমে চঞ্চল তুমি করিলে হৃদয়
সেই প্রেমে আরবার হব নিমগন।

———

বোম্বাই সমাজসংস্কার।

ভাই—

সেদিন এখানকার ইউনিয়ন্ ক্লবের অধিবেশনে আমাদের সবজজ চিন্তামণ নারায়ণ ভট বিবাহসংস্করণ বিষয়ে এক বক্তৃতা দেন তাহাতে আমি উপস্থিত ছিলাম। পুণায় পার্টি লইয়া কতকদিন হইতে সংবাদপত্রে যে ভয়ানক তুফান বহিতেছে তাহা দেখিয়া এ দেশীয় সমাজসংস্কারকদের উপর আমার এমন অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছে যে, তাহাদের বক্তৃতা শুনিলে গায়ে জ্বর আসে, তথাপি নিমন্ত্রণের উপরোধ আর কৌতূহলও ছিল ভটজী কি বলেন। তিনি যাহা বলিলেন তাহার সারাংশ এই :—সমাজসংস্কার সম্বন্ধে নানা লোকের নানা মত কিন্তু কোন কোন বিষয়ে আমাদের মতের মিল থাকিলেও কাজের বেলায় অগ্রসর হইতে সাহস করি না। এরূপ ধর্ম্মভীরুতা নিন্দনীয়। এই সকল ভীরুদিগকে যদি উভয় কূল রক্ষা করিয়া চলিবার কোন সদুপায় দেখাইয়া দেওয়া যায় তাহাতেও লাভ আছে। তিনি বিবাহ সম্বন্ধীয় তিনটী বিষয়ের অবতারণা করিলেন।

বাল্যবিবাহ।

বিবাহে ব্যয়বাহুল্য।

এক বর্ণের ভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধ।

আমাদের মধ্যে বিবাহে অনেকে বিস্তর ব্যয় করিয়া পরিশেষে সন্তাপ কিনিয়া লন—এই প্রথা অতীব অনিষ্টকর। সকল কার্য্যেই আপনার আয় বুঝিয়া ব্যয় করা কর্ত্তব্য। যে জাতিতে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীর সংখ্যা অধিক তাহাদের মধ্যে বরপক্ষীয়েরা অনেক হাঁকিয়া বসেন, কন্যাকর্ত্তাদের দায়ে পড়িয়া পণ অঙ্গীকার করিতে

হয়। তা ছাড়াও অনেক গরীব লোক ধার কর্জ্জ করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হয়। ইহার প্রতিবিধান সহজসাধ্য। গুজরাত রাজপুতানা প্রভৃতি স্থানে এই অনিষ্ট নিবারণের চেষ্টা দেখা যায়, এদেশেও ইহার সূত্রপাত করা উচিত।

এক জাতির বিভিন্ন শাখার মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধেও বিশেষ কোন বাধা হইতে পারে না। যাহাদের মধ্যে পরস্পর পান-ভোজনের নিয়ম আছে তাহাদের বিবাহে আদান প্রদান চলিবে না কেন? আমাদের দেশের হাওয়ার গুণে জাতিগত পার্থক্য আসিয়া পড়ে; যাহাতে জাতির মধ্যে ঐক্য স্থাপন হয় তাহার প্রতি প্রত্যেক দেশহিতৈষী জনের লক্ষ্য যত্ন ও চেষ্টার প্রয়োজন। রাজনৈতিক উন্নতির জন্য আমরা আবদার করিতে ছাড়ি না, কিন্তু সামাজিক ঐক্যবন্ধন সে উন্নতির প্রথম সোপান। যে সকল কারণে জাতিতে জাতিতে বর্ণে বর্ণে পার্থক্য উৎপাদন করিতেছে তাহা সাধ্যমত পরিহার কর, আপনা হইতেই জাতীয় উন্নতির সূত্রপাত হইবে। এক জাতির ভিন্ন শাখার মধ্যে বিবাহের বাধা কি তাহার কোন সমীচীন কারণ ভাবিয়া পাওয়া যায় না। গুজরাতে নাগর ব্রাহ্মণদের মধ্যে দেখা যায় যাহারা সহরে বাস করে তাহারা পল্লীগ্রামস্থ নাগরদিগকে হেয় জ্ঞান করিয়া কন্যা দিতে নারাজ। আমাদের মধ্যে যেমন রাঢ়ী বারেন্দ্রের মধ্যে বিবাহ নিষেধ, এদেশে ব্রাহ্মণদের মধ্যেও কতকটা সেইরূপ দেখা যায়। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণদের তিনশ্রেণী— দেশস্থ, কোকনস্থ, কহ্লাড়। তাহারা মূলে একজাতি কিন্তু বাস-স্থানের পার্থক্যবশতঃ তাহাদের মধ্যে পরস্পর বিবাহসম্বন্ধ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তাহাদের মধ্যে পরস্পর পানভোজন চলে কিন্তু বিবাহ সম্বন্ধ নাই। এই পার্থক্য দূর হইয়া যাহাতে ঐক্যবন্ধন হয়

তাহার উপায় সহজসাধ্য, কারণ ইহার মূলে কোন শাস্ত্রীয় বিধান নাই—দেশাচারের শৃঙ্খল ভাঙ্গিতে পারিলেই কার্য্যসিদ্ধি হয়। এইরূপ শুনা যায় যে, প্রথম বাজীরাও এই তিন শ্রেণীর ঐক্যসাধন মানসে প্রত্যেক শ্রেণী হইতে এক একটী কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। আমরা এখন কেন এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ না করি?

বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে অনেকেই অনেক কথা বলিয়া থাকেন। শিক্ষিত নব্য দলের মধ্যে অধিকাংশ লোকে এই প্রথার দোষ স্বীকার করেন। বালক বালিকার যে শিক্ষার বয়স সে বয়সে তাহার স্কন্ধে বিবাহভার চাপাইয়া দিলে শিক্ষার ব্যাঘাত হয় ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। মাতা অল্পবয়সে প্রসূতি হইলে সন্তান দুর্ব্বল ও রুগ্ন হয় ইহাই বা কে না স্বীকার করিবে? তবে পিতামাতা কেন তাঁহাদের সন্তানের অকালে বিবাহ দিতে এত ব্যস্ত! পিতামাতার কর্ত্তব্য সন্তানদের যথোচিত শিক্ষা দান করিয়া তাহাদিগকে জীবনসংগ্রামের উপযুক্ত করা, বিবাহের ঘটকালী করা তাঁহাদের কর্ত্তব্যের মধ্যে নয়। বিবাহ স্ত্রীপুরুষের নিজস্ব সামগ্রী। তুমি বলিবে হিন্দু সমাজের যেরূপ গঠন্ তাহাতে স্ত্রীপুরুষের কোর্টসিপের সুবিধা নাই—বাপমায়ের ঘটকালী ব্যতীত চলে না, কিন্তু তাই বলিয়া একথা বলিতে পার না যে, বিবাহকালে আসল পাত্র পাত্রীর নিজস্ব মতামতের কোন প্রয়োজন নাই। তাহাদের অপ্রাপ্ত বয়সে যখন তাহারা বিবাহের অর্থই বুঝিতে পারে না—নিজের মতামত ব্যক্ত করিতে পারে না—তখন তাহাদের স্কন্ধে এমন গুরুভার চাপাইয়া দেওয়া যাহা তাহাদিগকে আজীবন বহন করিতে হইবে—কিছুতেই নিষ্কৃতি পাইবার পন্থা নাই—পিতা মাতার কি অন্যায়! বাল্যবিবাহ হইতে হিন্দুসমাজে যে সকল মহা অনিষ্ট উদ্ভূত হইতেছে তাহা কাহারো

চখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইবার আবশ্যক নাই। অনেকেই বাল্য-বিবাহের দোষ স্বীকার করেন, কিন্তু কাজের বেলায় তাঁহারা বড় এগোতে চান না। ভটজী ইহার একটি সহজ উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি বলেন বাগ্দান হইয়া থাকু, উপযুক্ত বয়সে বিবাহ দেওয়া যাইবে। তাহাতে হিন্দুশাস্ত্রের নিয়ম ভঙ্গ হয় না। তিনি নিজের পরিবারে তাহাই করিয়াছেন। তাঁহার বারো বৎসরের কন্যার একটী আঠার বৎসরের বালকের সঙ্গে বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে। বালকটী নাগপুর কালেজে অধ্যয়ন করিতেছে, কন্যা পুণা স্ত্রীবিদ্যালয়ের ছাত্রী। তাহাদের মধ্যে এক্ষণে কেবল বাক্-নিশ্চয় হইয়াছে, কতক বৎসর পরে বিবাহ হইবে। এখন বিবাহ দিলে কন্যাটির লেখাপড়া বন্ধ হয়—তাহাকে শ্বশুরালয়ে পাঠাইবার আবশ্যক হয়—উল্লিখিত উপায়ে দু' দিক বজায় রহিল। কিন্তু এ উপায় কতদূর ফলোপধায়ী সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। বাক্-নিশ্চয় কতদূর বন্ধনকারী? মনে কর বিবাহের আগে ভাবী বরের মৃত্যু হইল, তাহার ফল কি হইবে? মেয়ে বিধবা গণ্য হইবে অথবা পুনর্ব্বিবাহে তাহার অধিকার থাকিবে! বিবাহ না করিয়াই বৈধব্য-যন্ত্রণা ভোগ করা সামান্য কষ্টকর নহে। আমার মতে এরূপ অর্দ্ধ পদক্ষেপের কোন ফল নাই—একেবারে লম্ফ প্রদান করিয়া বেড়া ডিঙ্গান' আবশ্যক। কিন্তু একটী বিষম বাধা আছে—সে বাধা মেয়েদের কাছ থেকে পাওয়া যায়। বাল্যবিবাহই বল আর কোন সামাজিক কুপ্রথাই বল—তাহা নিবারণের প্রধান উপায় হচ্চে স্ত্রীশিক্ষা। স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার কর, অল্পে অল্পে সকল প্রকার সামাজিক উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদিত হইবে সন্দেহ নাই। অন্যান্য উপায় একদেশব্যাপী ও নিষ্ফল।

এদেশে স্ত্রীজাতির শিক্ষা ও উন্নতি সাধন বঙ্গদেশ অপেক্ষা সহজসাধ্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাহার এক কারণ এদেশে অবরোধপ্রথা নাই। এখানে আমাদের দেশের মত অবগুণ্ঠনও নাই—অন্তঃপুরও নাই। ইহা হইতেই বোধ হয় অবরোধপ্রথা আসল হিন্দু প্রথা নয়—যে সকল দেশ বহুদিন মুসলমানদিগের অধীনে ছিল সেই সকল দেশে এই কুপ্রথা প্রচলিত হইয়াছে। সে যাহা হউক অবরোধপ্রথা নাই বলিয়া এদেশের স্ত্রীলোকদের অবস্থা বঙ্গনারীদের অপেক্ষা যে অধিক উন্নত তা ত বোধ হয় না। যদিও অন্তঃপুরবাসের কড়াকড় নিয়ম নাই তথাপি ভদ্র মেয়েরা সেই পিঞ্জরের পাখী—জনসমাজে স্ত্রীপুরুষের মেলা-মেশা কৈ ত এখানে দেখা যায় না। ইহার কারণ কি? আমি যতদূর দেখিতেছি এখানে পরদা ভাঙ্গা কিছুই দুষ্কর নহে—কেবল একজন পথপ্রদর্শক আবশ্যক। বোম্বাই পুণা প্রভৃতি বড় বড় সহরে স্ত্রীস্বাধীনতা অনেক প্রসারিত দেখা যায়। এ দেশীয় রাজাদের মধ্যেও কেহ কেহ এ বিষয়ের দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন। গোণ্ডলের রাজা, বরদার গাইকওয়াড় সস্ত্রীক ইউরোপে গিয়া ইহার পথ অনেকটা মুক্ত করিয়াছেন। বিশ বৎসর পূর্ব্বে কি ছিল আর এখনই বা কি? এ বিষয়ে কত পরিবর্ত্তন! আমরা নিজ নিজ পরিবারমধ্যেই কত পরিবর্ত্তন অনুভব করিতেছি—রাজা রাণীও এই স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছেন—ক্রমে সেই দুয়া সুয়া রাণীর জেনানাবদ্ধ পরিবারের মধ্যেও আলোক বাতাস প্রবেশ করিতেছে। যাঁহারা এই পরিবর্ত্তন দেখিয়া বিলাপ করেন তাঁহারা জানেন না স্ত্রীলোকের বিনয় লজ্জা স্বাভাবিক ভূষণ, অবগুণ্ঠনের প্রয়োজন নাই—ধর্ম্মরক্ষার জন্য অন্তঃপুর-জেলখানার আবশ্যক নাই—মুক্ত সংসারই স্ত্রীপুরুষের ধর্ম্মক্ষেত্র—

অরক্ষিতা গৃহে রুদ্ধাঃ পুরুষৈরাপ্তকারিভিঃ।
আত্মানমাত্মনা যাস্তু রক্ষেয়ুস্তাঃ সুরক্ষিতাঃ॥

এখনো কি আমাদের দেশে কুলীনদের মধ্যে বহুবিবাহ প্রচলিত আছে! সেদিন একটা কাগজে দেখিতেছিলাম সেই পুরাতন রোগের অদ্যাপি অনেক অবশিষ্ট আছে। মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁহার জীবদ্দশায় বহুবিবাহ সম্বন্ধীয় এক তালিকা প্রস্তুত করেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভার সঙ্গে তাঁহার কৌলীন্য প্রথা লইয়া তর্কবিতর্ক হয়। সভার মতে কুলীনদের মধ্যে বহুবিবাহের সংখ্যা ক্রমে কমিয়া আসিতেছে। তাহার প্রতিবাদে বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেন হুগলী জিলায় ন্যূনাধিক ১০০ পল্লী পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে ১৩৩ জন লোকের প্রত্যেকের পাঁচ অপেক্ষা অধিক সংখ্যক পত্নী। তিনি নাম ধাম সমেত এই বিবাহের এক তালিকা প্রস্তুত করেন তাহা হইতে দেখা যায় একজনের ৮০ জন ভার্য্যা—একজনের ৭২—তৃতীয়ের ৬২, চতুর্থের ৫৬, পঞ্চমের ৫৫, ষষ্ঠের ৪৪। তিন জনের প্রত্যেকের ৫০ স্ত্রী—তিন জনের ৪০—সাত জনের ২১ হইতে ২৮—ছয় জনের ২০—তের জনের ১৬—চৌদ্দ জনের ১০—ষোল জনের ১৬—একুশ জনের ৫। যাহাদের বিবাহ পাঁচের কম তাহাদের সংখ্যা এত অধিক যে তাহা নির্দ্দেশ করিতে গেলে সমুদায় পুঁথি ভরিয়া যায়। ২০ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গলার এক ক্ষুদ্র প্রান্তের এই অবস্থা। এইক্ষণে কিরূপ? সঞ্জীবনীসম্পাদক গত বর্ষে এই বিষয়ে এক তালিকা প্রকাশ করেন। তিনি ৩২৮ গ্রাম পরিদর্শন করেন ও গত বিংশতি বৎসরের মধ্যে যাঁহারা বিবাহ করিয়াছেন—যাঁহাদের ৫ হইতে ৩৫ বৎসর বয়স তাঁহাদের জীবনী অনুসন্ধান করিয়া দেখেন। প্রায় ৫৮৪টী ব্রাহ্মণ-বিবাহ তাঁহার সমালোচনার

বিষয়। ফলে এই দাঁড়ায়, ৩৩৯ জনের দুই স্ত্রী আর ২৪৫ জনের দুয়ের অধিক স্ত্রী। এই ২৪৫ জন ব্রাহ্মণের মধ্যে ৩৯ এর ৩ স্ত্রী—৩১এর ৪, ৮ জনের ৫, ৯ জনের ৬, ৫ জনের ৭, ৫ জনের ৮, ১০ ১২, ১৩ করিয়া দুই দুই জনের বিবাহ। ৩ জনের ১৪, এক জনের ৩২। একজন ১২ বৎসরের বালকের দুই স্ত্রী। একজন ৩৭ বর্ষীয় যুবকের ৩৫ পত্নী বর্ত্তমান। কি ভয়ানক! বিদ্যাসাগর মহাশয় যে তালিকা প্রস্তুত করেন তাহাতে যে সকল বিবাহের উল্লেখ আছে তাহার পরে ইহার অধিকাংশ বিবাহ সঙ্ঘটিত হয়। ইহা হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে বঙ্গদেশে বহুবিবাহ প্রথা বিলক্ষণ সতেজ। যে তালিকা দেওয়া হইল তাহা কেবল কতকগুলি গ্রামের মধ্যে বদ্ধ, সমুদায় বঙ্গভূমির অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে এই অনিষ্টময় প্রথা কতদূর ব্যাপী তাহা সহজে অনুধাবন করা যাইতে পারে। যাঁহারা হিন্দুসমাজে গার্হস্থ্যাশ্রম পরিশোধিত দেখিতে চান তাঁহারা এই কুপ্রথা উন্মূলনে কায়মনে যত্নবান্ হউন।

লোক-চেনা।

শিরোলক্ষণ।

দৈহিক প্রকৃতির লক্ষণ দেখিয়া কি রূপে লোক চিনিতে হয় তাহা ইতিপূর্ব্বে বর্ণনা করা গিয়াছে। এক্ষণে, মস্তকের গঠন দেখিয়া কিরূপে চরিত্র নির্ণয় করিতে হয় তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করা যাইতেছে। আমাদের মনোবৃত্তি কতগুলি, তাহাদের কি

কি কার্য্য, মস্তিষ্কের কোন্ কোন্ অংশে তাহাদের স্থান, ইত্যাদি তথ্যগুলি প্রথমতঃ মোটামুটি জানা আবশ্যক।

মনোবৃত্তির দুই প্রকাণ্ড বিভাগ—জ্ঞান ও ভাব। তন্মধ্যে জ্ঞান ও বুদ্ধির স্থান হচ্চে কপাল—মস্তকের বাকি অংশ যাহা কেশে আবৃত তৎসমস্তই ভাবের স্থান। ভাব দুই ভাগে বিভক্ত;—নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি ও উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি। মস্তকের নিম্নপার্শ্ব ও পশ্চাদ্ভাগ নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির স্থান। নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির আধিক্য হইলে কানের উপরে ও পশ্চাতে মাথার গঠন চওড়া ও ভরপুর দেখায়। যাহাদের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি ক্ষীণতর তাহাদের ঐ অংশ অর্থাৎ মাথার দুই পার্শ্ব পাত্‌লা ও সংকীর্ণ। নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি আবার দুই ভাগে বিভক্ত;—গার্হস্থ্যপ্রবৃত্তি ও স্বার্থপ্রবৃত্তি। গার্হস্থ্যপ্রবৃত্তি চারিটি;—স্ত্রৈপুরুষিক আসক্তি, বাৎসল্য, সখ্য, ও বাস্তনিষ্ঠা অর্থাৎ নিজ বাসস্থানের উপর মায়া। গার্হস্থ্যপ্রবৃত্তির আধিক্য হইলে মাথার পিছন দিক্‌টা লম্বাটে ও ভরপুর দেখায়। এবং উহার লাঘব হইলে ঐ অংশ চ্যাপ্‌টা ও খর্ব্ব দেখায়। স্বার্থ-প্রবৃত্তি এই-গুলি যথা,—(১) প্রতিবিধিৎসা অর্থাৎ বাধা অতিক্রমের ইচ্ছা—যুঝাযুঝি করিবার ইচ্ছা—সাহস; (২) জিঘাংসা অর্থাৎ ধ্বংশ করিবার—হানি করিবার ইচ্ছা—ক্রোধ; (৩) বুভুক্ষা অর্থাৎ আহারের ইচ্ছা; (৪) অর্জ্জন-স্পৃহা; (৫) জুগোপিষা অর্থাৎ মনের ভাব গোপন করিবার ইচ্ছা। মস্তকের পার্শ্বদেশে ও কানের চতুষ্পার্শ্বে এই সকল প্রবৃত্তির স্থান। উহাদের আধিক্য হইলে মাথার ঐ অংশ স্থূল ও বর্ত্তুলাকার দেখায়—কিন্তু উহাদের স্বল্পতা হইলে ঐ অংশ চ্যাপ্‌টা ও সংকীর্ণ দেখায়। উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি তিনভাগে বিভক্ত। যথা;—(১) উচ্চতর স্বার্থভাব (২) ধর্ম্মভাব ও (৩) বুদ্ধি-মিশ্র ভাব। উচ্চতর স্বার্থভাব এই গুলি যথা;—সাব-

ধানতা, লোকাদরপ্রিয়তা, আত্ম-সম্ভ্রম ও দৃঢ়তা—মাথার তেলোর শেষাংশ ও সেই শেষাংশের পার্শ্বদেশ এই সকল ভাবের স্থান। মাথার তেলোর বাকি অংশ ধর্ম্মভাবের স্থান। ধর্ম্ম-ভাব এইগুলি যথা;—সত্যনিষ্ঠা, আশা, বিশ্বাস, ভক্তি ও দয়া। মাথার তেলোর পুরোভাগ এই সকল ধর্ম্মভাবের স্থান—ধর্ম্মভাবের আধিক্য হইলে ঐ অংশ দীর্ঘ ও উচ্চ হইয়া থাকে; এবং উহার স্বল্পতা হইলে ঐ অংশ নীচু হয় ও ক্রমবক্র না হইয়া যেন হঠাৎ নাবিয়া গিয়াছে এইরূপ প্রতীয়মান হয়। বুদ্ধি-মিশ্র ভাব এইগুলি;—যথা, নির্ম্মিৎসা অর্থাৎ নির্ম্মাণ করিবার প্রবৃত্তি—হস্তনৈপুণ্য ইত্যাদি; ভাবুকতা বা সৌন্দর্য্যানুরাগ; অনুচিকীর্ষা অর্থাৎ অনুকরণ করিবার ইচ্ছা এবং জিহসিষা অর্থাৎ হাস্যপ্রিয়তা। ইহার কিয়দংশ কপালের পার্শ্বদেশে ও কিয়দংশ সাম্‌নেকার মাথার তেলোর পার্শ্বদেশে অব-স্থিত।

এই সকল বৃত্তির আধিক্য হইলে মস্তকের ঐ অংশ চওড়া ও পরিপুষ্ট বলিয়া মনে হয়—এবং উহাদের স্বল্পতা হইলে ঐ অংশ চ্যাপ্‌টা ও সংকীর্ণ দেখায়।

প্রত্যক্ষজ্ঞান এইগুলি যথা:—বস্তুবোধ, আকার-বোধ, পরিমাণ-বোধ, ভার-বোধ, বর্ণ-বোধ, শৃঙ্খলা-বোধ, সংখ্যা-বোধ ও স্থান-বোধ। এই সকল বৃত্তির দ্বারা বস্তুর বস্তুত্ব ও বিবিধ ভৌতিক গুণ আমাদের উপলব্ধি হয়। কাজকর্ম্মের সময় এই সকল জ্ঞান বড়ই আমাদের সহায়তা করে। এই সমস্ত জ্ঞানের আধিক্য হইলে কপালের নিম্নদেশ অর্থাৎ যেখানে ভুরু থাকে সেই স্থান বাহির-করা ও ঝোঁকা বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এই সমস্ত বিশুদ্ধ প্রত্যক্ষ-

জ্ঞান—এতদ্ব্যতীত আর এক শ্রেণীর জ্ঞান আছে যাহাকে বিমিশ্র প্রত্যক্ষজ্ঞান বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ উহারা বুদ্ধিবৃত্তি ও প্রত্যক্ষজ্ঞানের সংমিশ্রণে উৎপন্ন। বিমিশ্র প্রত্যক্ষ জ্ঞান এইগুলি ;—যথা, ঘটনা-বোধ বা স্মৃতি, কাল-বোধ, সুর-বোধ, ভাষা-শক্তি অর্থাৎ কথার দ্বারা মনোভাব প্রকাশ করিবার শক্তি ; ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই কপালের মধ্যভাগে অবস্থিত। এই জ্ঞানের আধিক্য হইলে কপালের মধ্যভাগ ফুলিয়া উঠে—এবং লাঘব হইলে ঐ স্থান বসা-বসা দেখায়। বুদ্ধিবৃত্তি দুইভাগে বিভক্ত। যথা অনুমিতি অর্থাৎ কার্য্য হইতে কারণ অনুমান করিবার শক্তি ও উপমিতি অর্থাৎ বিবিধ পদার্থের মধ্যে সম্বন্ধ ও সৌসাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য উপলব্ধি করিবার শক্তি। বুদ্ধি-বৃত্তির আধিক্য হইলে কপালের উপরাংশ উচ্চ, প্রশস্ত, ও বহিরুন্মুখ হইয়া থাকে।

মাথার পশ্চাদ্ভাগে সামাজিক ও গার্হস্থ্য প্রবৃত্তির স্থান ; মাথার তলদেশে স্বার্থ-প্রবৃত্তির স্থান ; মাথার তেলোদেশে ধর্ম্মবৃত্তির স্থান এবং কপালে জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তির স্থান। এই সকল বৃত্তির বিভিন্ন মাত্রা ও সংযোগফলে ব্যক্তি বিশেষের চরিত্রগত পার্থক্য উৎপন্ন হয়। যাহার মস্তকের পুরোভাগ অপেক্ষা পশ্চাদ্ভাগ বড়, মোটামুটি বলিতে হইলে, জ্ঞান অপেক্ষা তাহার ভাবাংশ সমধিক প্রবল। যাহার মস্তকের তেলোদেশ অপেক্ষা তলদেশ ও পার্শ্বদেশ বড়, তাহার স্বার্থ প্রবৃত্তি অপেক্ষাকৃত প্রবল ও ধর্ম্মবৃত্তি ক্ষীনভাবাপন্ন। কার্য্যে তাহার খুব উদ্যম, উৎসাহ কিন্তু তাহা সৎপথে নিয়োজিত না হইতে পারে। ইহার বিপরীতে,যাহার মস্তকের তলদেশ অপেক্ষা তেলোদেশ বড়, তাহার ধর্ম্মভাব প্রবল কিন্তু কার্য্য করিবার উদ্যম উৎসাহ কম অর্থাৎ তাহার চালকবৃত্তি অপেক্ষা নায়কবৃত্তি প্রবল।

যাহার স্বার্থ-প্রবৃত্তি ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি উভয়ই খুব প্রবল কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তি ততটা প্রবল নহে সে প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে বটে, কিন্তু সংগ্রামে সে অনেক সময়েই পরাভূত হয়; তাহার জীবনে অসঙ্গতি লক্ষিত হয়; কখন মনে হইবে লোকটা বড়ই প্রবৃত্তির বশীভূত, কখন মনে হইবে বেশ ধর্ম্মিষ্ঠ। কিন্তু ঐ সঙ্গে যাহার বুদ্ধিবৃত্তিও বলবতী, তাহার জীবনে এরূপ অসঙ্গতি লক্ষিত হয় না। যাহার স্বার্থ-প্রবৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি প্রবল অথচ ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি দুর্ব্বল, তাহার মানসিক শক্তিসমূহ কার্য্যকরী ও উদ্যমবিশিষ্ট হইলেও তাহার নৈতিক চরিত্র জঘন্য—তাহার সমস্ত বুদ্ধি উদ্যম কুপথে চালিত হয়।

যাহার বুদ্ধিবৃত্তি অপেক্ষা প্রত্যক্ষবৃত্তি অধিক প্রবল তাহার মনভাণ্ডার বিবিধ বিষয়ের তথ্যে পরিপূর্ণ—তাহার জ্ঞানস্পৃহা অতীব বলবতী—সহজেই সে জ্ঞান অর্জ্জন করিতে পারে, খুটিনাটি করিয়া দেখিবার শক্তি তাহার বিলক্ষণ থাকে—কাজকর্ম্মের ব্যবহারিক বুদ্ধি তাহার সমধিক প্রবল কিন্তু তাহার বুদ্ধির তীক্ষ্নতা, গভীরতা, ও উদ্ভাবনী শক্তির অভাব। কাজকর্ম্মে বেশ দক্ষ কিন্তু কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে তাহা নির্ণয় করিতে সে সহজে পারে না এবং যে সকল কার্য্যে বহুলতা ও জটিলতা আছে সে সকল কার্য্যের তত্ত্বাবধানতা তাহার দ্বারা হইয়া উঠিবে না। লোকটা গুণী হইতে পারে, পণ্ডিত হইতে পারে কিন্তু কোন বিষয়ের গভীর চিন্তা তাহার দ্বারা হইয়া উঠে না—কোন বিষয়ের মূলতত্ত্ব সে ভাল বুঝিতে পারে না। যাহার কপালের নিম্নাংশ অপেক্ষা উপরাংশ বড় অর্থাৎ যাহার প্রত্যক্ষবৃত্তি অপেক্ষা বুদ্ধিবৃত্তি অপেক্ষাকৃত প্রবল তাহার দর্শনশক্তি অপেক্ষা চিন্তাশক্তি বলবতী—

তথ্য অপেক্ষা তত্ত্বেরদিকে তাহার অধিক টান্। কোন বিষয়ের খুটি-নাটি দেখিতে তাহার ভাল লাগে না—সকল বিষয়ের মূলতত্ত্ব জানিয়াই সে সন্তুষ্ট; পদার্থের গুণাগুণ অপেক্ষা পদার্থ সমূহের সম্বন্ধ নির্ণয়ে তাহার অধিক অনুরাগ; প্রাকৃতিক বিজ্ঞান অপেক্ষা যে-সকল বিজ্ঞান বিশ্লেষণ ও প্রমাণ সাপেক্ষ তাহারই অনুশীলনে তাহার অধিক প্রীতি। যাহার বুদ্ধিবৃত্তি প্রত্যক্ষবৃত্তি উভয়ই বলবতী এবং দৈহিক প্রকৃতিও সতেজ তাহার বিশ্বপ্রসারিণী চৌকোষ বুদ্ধি এবং তাহার মন তথ্য ও তত্ত্ব উভয়েই সুসজ্জিত। যাহার মাথার চারিদিক বেশ সমান, যাহার সকল বৃত্তিই সমান পরিপুষ্ট, তাহার চরিত্রগত বিশেষত্ব বড় উপলব্ধি হয় না—তাহার কোন বিষয়ে আধিক্যও নাই ন্যূনতাও নাই; সে বেশ একরকম কাজ কর্ম্ম চালাইতে পারে; যেরূপ চারিদিককার অবস্থা তদনুসারে তাহার চরিত্র গঠিত হয় এবং সে নিঃশব্দে ও শান্তভাবে জীবন-পথ অতিবাহিত করে; কিন্তু যদি ঐ সঙ্গে তাহার মস্তিষ্ক বৃহদায়তন ও সক্রিয় হয় এবং অবস্থাও যদি অনুকূল হয়, তাহা হইলে তাহার প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী হয়—সকল বিষয়েই সে মহত্ত্ব লাভ করিতে পারে। যাহার মাথার সবদিক সমান নহে—কোন দিক বেশি, কোন দিক কম তাহার চরিত্রের খুব বিশেষত্ব উপলব্ধি হয়। যাহার আত্মসম্ভ্রম প্রবল, বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মবৃত্তি প্রবলতর এবং স্বার্থ-প্রবৃত্তি প্রবল নহে, তাহার চরিত্রে সম্ভ্রান্ত ভাব, পুরুষোচিত আত্ম-নির্ভর, উদারতা, উন্নত মহৎভাবের প্রকাশ দেখা যায়—সকল প্রকার নীচতা, ইতরামি তাহার নিকট অতীব হেয়। কিন্তু এইরূপ প্রবল আত্মসম্ভ্রমের সহিত যদি বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মবৃত্তির লাঘব হয় এবং স্বার্থ প্রবৃত্তির অধিক্য থাকে তাহা হইলে সে ব্যক্তির

চরিত্রে অহংকার, উদ্ধতভাব, প্রভুত্বপ্রিয়তা, অনধিকার চর্চ্চা প্রভৃতি অপ্রীতিকর লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়। সাধারণ নিয়ম এই যে, প্রবল বৃত্তিগুলি অপ্রবল বৃত্তির উপর আধিপত্য করে—চরিত্রের নেতারূপে অবস্থিতি করে। যথা ;—যাহার জিঘাংসা ও প্রতিবিধিৎসা সমধিক, এবং তাহার সঙ্গে আত্মসম্ভ্রমও প্রবল, সে অপমানিত হইলে প্রতিশোধ লইবার চেষ্টা করিবে, নিজ স্বার্থসাধনে তৎপর হইবে—অন্যের উপর প্রভুত্ব করিবে ইত্যাদি; কিন্তু তাহার যদি আত্মসম্ভ্রম প্রবল না হয় এবং দয়া ও কর্ত্তব্য-পরতা প্রবল হয় তাহা হইলে সে নিজের জন্য প্রতিশোধ লইতে বিরত হইবে—কিন্তু পরের স্বার্থরক্ষার্থ, সত্যের জন্য, ন্যায়ের জন্য, সে বদ্ধপরিকর হইবে। এইরূপ বিবিধ বৃত্তির প্রবলতা ও অপ্রবলতা হইতে চরিত্রের বিশেষ বিশেষ লক্ষণ প্রকাশ পায়।

স্বরলিপি।

(শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেরিত)

হিন্দুস্থানী গান।

গৌর সারঙ্গ—তাল কাওয়ালী।

স্বজনি, মন-মোহন মুরলী মনমোহে,
স্বজনিয়া রহে না শকতু পলছন রে।
চলরি সখিয়া, বিতি যাতি রাতিয়া,
আওয়ে সোহি ননদিয়া মোরা,
মনহর লিন্থ মোরা চোরা রে।

°|°

।০।১।২´।৩।

০ ১ ২´
পা ॥ মা গা ধা পা। মা গা রা সন্া। সা সা গা রা।
স্ব ॥ জ নি, ম ন। মো হ ন, মু। র লী, ম ন।

৩ ॥
। মা গা -া পা। মা গা সা -া। সা সা গা রা।
। মো হে — স্ব। জ নি য়া —। র হে না, শ।

১
। মা গা পা পা। পা না ধা পা ॥ পা ধা পা র্সা।
। ক তু, প ল। ছ ন, রে স্ব ॥ চ ল রি, স।

র্সা র্সা র্সা র্সা। ধা -না র্সা র্রা। র্সা না ধা পা।
। খি য়া, বি তি। যা — তি, রা। তি য়া, আও রে।

। পা -া -া ধা। পা মা গা মা। রা -গা -রগা -মা।
। সো — — হি। ন ন দি য়া। মো — — —।

। গা -া -া -া। সা সা গা রা। মা গা পা পা।
। রা — — —। ম ন হ র। লি মু, মো রা।

। পা না ধা পা ॥
। চো রা রে, স্ব ॥

(মায়ার খেলা হইতে)

মিশ্র ভূপালী—ছন্দ একতালা।

সখি, বহে গেল বেলা,

শুধু হাসিখেলা,

একি আর ভাল লাগে।

আকুল তিয়াষ,
প্রেমের পিয়াস,
প্রাণে কেন নাহি জাগে।
কবে আর হবে থাকিতে জীবন
আঁখিতে আঁখিতে মদির মিলন,
মধুর হুতাশে মধুর দহন
নিত নব অনুরাগে।
তরল কোমল
নয়নের জল
নয়নে উঠিবে ভাসি।
সে বিষাদ-নীরে
নিবে যাবে ধীরে,
প্রখর চপল হাসি।
উদাস নিঃশ্বাস আকুলি উঠিবে
আশা-নিরাশায় পরাণ টুটিবে
মরমের আলো কপোলে ফুটিবে
সরম অরুণ রাগে॥

৩৭

॥

সর্সা ॥ সগা -া রা। গা গা গা । গমা গমপা মপমা।
সখি ॥ বহে,— গে। ল, বে লা । শুধু, — হা ।

। গাঃ গঃ গমগা। গরা রা রা। -া -া ররা । রাঃ -গঃ -রগমপা।
। সি, খে লা । এ কি,আ। র, ভাল। লা — — ।

। মগা রগাঃ -রসন্ঃ। সা গা রা। গমপা -মপমঃ গঃগা।
। গে, সখি — । ব হে গে। ল — বেলা।

। গা গপা পা। পক্ষা পা পমগা। গপা -া পা।
। আ কু ল। তি য়া য । প্রেমে — র।

। ধা পধনা নধপা। পা ধা পধঞা। ঞধা পক্ষা পমগা।
। পি য়া স । প্রা ণে, কে । ন, না হি ।

। গঃমগঃ -রা -গমপা। মগা রা গরা॥ পা গপা পা।
। জা — —। গে, স খি ॥ ক বে, আ।

। ক্ষপধা ধপা ধা। ধর্সা -া নর্সর্রা। র্র্সা র্সা -া। ^ন^র্সা র্সা নর্সনা।
। র, হ বে। থাকি—তে । জী ব ন্। আঁ খি তে।

। ধা ধনা পা। ধা ধনর্সা র্সনা । ধনঃধঃ ক্ষপধা -পঃক্ষপঃ।
। আঁ খি তে। ম দি র। মি ল ন্ ।

। গপা পা পা। পক্ষা পা পক্ষপা। গা পা পা। ধা পধনা -নধপা।
। ম ধু র। হ তা শে । ম ধু র। দ হ ন ।

। পা ধা ধঞা। ধঞধা পক্ষা পমা। গঃমগঃ -রা -গমপা।
। নি ত, ন । ব, অ নু। রা — —

। মগা রা গরা॥ {সা রা রা। রা গা গা
। গে, স খি॥ {ত র ল। কো ম ল

। রা গা গমপা। মপমা গা -া। গপা পা পা।
। ন য় নে । র্ জ ল্। ন য় নে।

। ধা পধনা নধা। পা -া -ধপধপা। (মগা রা গরা) ।}
। উ ঠি বে। ভা — — । (সি স খি) ।}

। মগা রা রা। গপা পা পা। পা পা পক্ষপা। গা পা পা।
। সি স খি। সে, বি ধা। দ, নী রে । নি বে, যা।

। ধা পধনা নধা। পা ধা ধঞধা। পক্ষা ক্ষপধা পঃমগঃ।
। বে, ধী রে। প্র থ র। চ প ল।

। গমা -রা -গমপা। মগা রা গরা। পা গা গপা। পা পা ধা।
হা — —। সি স খি। উ দা স। নিঃ শ্বা স।

। ধা র্সা নর্সর্রা। র্র্সা র্সা র্সা। নর্সা র্সা না। ধা -ধঃনধঃ-পা।
। আ কু লি। উ ঠি বে। আ শা, নি। রা শা য়।

। ধা ধনর্সা র্সনা। ধনা ধপা পক্ষপা। গপা পা পা।
। প রা ণ। টু টি বে। ম র মে।

। -1 পা পধপা। ক্ষা পা পা। ধা পধনা নধা। পা ধা ঞধা।
। র, আ লো। ক পো লে। ফু টি বে। স র ম।

। পক্ষা পক্ষধা পমা। গমগা -রা -গমপা। মগা রা গরা ॥
। অ রু ণ। রা — —। গে, স খি ॥

ব্যাখ্যা।

(১) বিসর্গ ঃ অর্দ্ধমাত্রার চিহ্ন।

(২) { } = পুনরাবৃত্তির চিহ্ন।

( ) = পুনরাবৃত্তিকালে কতকগুলি স্বর বাদ দিবার চিহ্ন।

(৩) পার্শ্ববর্ত্তী যুগল ছেদ আস্থায়ীতে ফিরিবার চিহ্ন। শিরোদেশস্থ যুগল ছেদ আস্থায়ীতে ফিরিয়া আসিয়া থামিবার চিহ্ন।

আমাদের পুতুলের বিয়ে।

আফিমের ঘোরে সারা রাতটা ঝিমাইয়া ভোরের দিকে একটু গাঢ় নিদ্রা হয়। বুড়া বয়সে আফিম ধরিয়া শরীরের কিছু উপকার হোক্ আর না হোক্—বহুকালের অভ্যাস প্রাতে শয্যাত্যাগ আর এখন নাই। বেলা আটটার সময় প্রখর সূর্য্যের আলোকে এখন আমার ঘুম ভাঙ্গে। আজ সবেমাত্র নিদ্রাটা একটু গাঢ় হইয়াছে, এমন সময় সহসা আনন্দ-কোলাহলে ঘুমটা ভাঙ্গিয়া গেল। শুনিলাম ভৈরবী রাগিণীতে বাঁশীও বাজিতেছে। বহুকাল পরে আজ প্রভাত দেখিলাম, বাঁশী শুনিয়া বহুকালের একটী স্মৃতি মনে জাগিয়া উঠিল। সেই একদিন এমনি প্রভাতে, এমনি বাঁশীর স্বরে জাগিয়া উঠিয়া আমার পাশে যে একখানি ঘুমন্ত আধ-ঘোমটা-দেওয়া কচি মুখ দেখিয়াছিলাম, সেই মুখখানি মনে পড়িল। সহসা নিদ্রাভঙ্গজনিত আলস্যময় ভাবে তখনি বিছানা ছাড়িয়া উঠিতে পারিলাম না। পূর্ব্ব আকাশের দিকে চাহিয়া কোলাহল শুনিতে লাগিলাম। বুঝিলাম আমাদেরই বাটী হইতে আনন্দোচ্ছ্বাস উঠিতেছে। আমারই নাতিনাতিনীর হাস্যধ্বনিতে, আমার মত পাড়ার লোকও জাগিতেছে। কিন্তু কিসের এত হাসি? কই আমাদের বাড়িতে তো আজকালের মধ্যে বিবাহ-উৎসব অথবা কোন মঙ্গলকার্য্য উপস্থিত নাই। আমার পুত্রকন্যাগুলির তো সকলেরই বিবাহ হইয়া গিয়াছে। দুই বৎসর হইল সর্ব্বমঙ্গলার বিবাহ দিয়া, আমি ইহকালের কায হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া সেই অজানিত প্রবাসে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছি। যদিও আমি নির্লিপ্ত থাকিতে চাহি বটে, কিন্তু

আমার সন্তানেরা তবুও আমাকে না জানাইয়া তো কোন কাষ করে না। আমার জ্যেষ্ঠা পৌত্রীটি সবে আট বৎসরের, তাহার বিবাহের এখনো বিলম্ব আছে। তাহার বিবাহের ভাবনা আর আমার ভাবিতে হইবে না—ততদিনে আমার ডাক পড়িবে—অথবা কি জানি? সকলি সেই মহামায়ার ইচ্ছা!—তবে আমার আর এখানে থাকিতে ইচ্ছা নাই। এখানে আমার থাকার কোন আবশ্যকও নাই। যাহাদের সংসারে আনিয়াছিলাম, তাহাদের প্রতি যথাযোগ্য কর্ত্তব্য কার্য্য শেষ করিয়াছি—তবে হে মা প্রকৃতি, আর এ অক্ষম জীবনে তোমার আবশ্যক কি?

কতবৎসর পরে আজ অরুণোদয় দেখিলাম—সেই পুরাতন আজন্মপরিচিত লাল গোলাকার সূর্য্য সহসা দেখিতে পাইলাম। সেই বাঁশী বাজিতেছে, সেই বালকবালিকার পরিচিত হাস্যধ্বনি—এ সকল ছাড়িয়া কি অনিশ্চিত, অপরিচিত অজানিত স্থানে যাইতে যথার্থই আমি ব্যগ্র হইয়াছি—না নিশ্চয় যাইতে হইবে এবং দিনও সংক্ষেপ হইয়া আসিতেছে জানিয়া মনকে প্রস্তুত করিতেছি?

"আরও কত ঘুমোবে—দাদামশায় ওঠো না—এমন ঘুমও তো কখনো দেখি নাই বাপু—এত গোলমালেও তোমার ঘুম ভাঙ্গলো না!" "দাদামশায় শিগ্‌গির ওঠো শিগ্‌গির ওঠো।" "আপনারা চেঁচামিচি করচিস্ কর্, বাবাকে কেন এত সকালে জালাতন করতে যাচ্ছিস্।" দেখিতে দেখিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালকবালিকারা আমার খাটের চারিপাশে ঘেরিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের পরে আমার কন্যাপুত্রেরা, তৎপরে বারান্দায় পুত্রবধূরাও উপস্থিত দেখিলাম। সকলেই উৎসাহপ্রফুল্লমুখে

আমাকে আনন্দের সংবাদ জানাইতে ব্যগ্র। আমি উঠিয়া বসিতেই সর্ব্বকনিষ্ঠ খোকা বলিল "দাদামছায় আদ্ আমাদেল্ পুতুলেল্ বিয়ে।" তাড়াতাড়ি মধ্যমা পৌত্রী বালা কহিল, "দাদামশায়, দাদামশায়, আজ দিদির মেয়ের বিয়ে।"

খোকা। দাদামছায় ছত্তির বিয়ে নয়, দিদির পুতুলেল্ বিয়ে।

তখন অষ্টমবর্ষীয়া দিদি আমার গলা ধরিয়া গম্ভীরভাবে বলিল, "হ্যাঁ দাদামশায়, আজ বাড়িতে কায, আর তুমি এত বেলা পর্য্যন্ত ঘুমোচ্ছো?"

আমি। ওরে বুড়ি আমার অপরাধ হোয়েছে তা মানলুম, কিন্তু কিসের কায তা তো আমি এখনো কিছু জানতেই পারিনি—ব্যাপারখানা কি রে?

দেখিলাম দরজার পাশ হইতে ঘোমটা-দেওয়া হাস্যমাখা মুখে, শঙ্খহস্তে বধূমাতা অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছেন—মতলবখানা, আমার ঘুম ভাঙ্গিলেই তিনি একবার শাঁখটা বাজান্। তখন ঝমুঝম্ করিয়া সর্ব্বমঙ্গলা "বাবা তোমাদের বাড়ি নেমন্তন্ন এসেছি গো" বলিয়া এক প্রণাম করিল। আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র জয়ন্ত নিকটে আসিয়া হাস্যমুখে কোপকটাক্ষে নলিনীর দিকে চাহিয়া কহিল, "এত বল্লুম বাবাকে এত সকালে জাগাস্‌নে—তা কেউ শুন্‌বে না—আগেভাগে বাবাকে জ্বালাতন করতে এসেছে। শোন না বাবা! নলির মেয়ের বিয়ের গল্পটা শোন না।"

আমি। শুন্‌ছি বই কি, সব শুনছি—তা কাল তো কিছু শুনি নাই, আজ হঠাৎ এত সকালে, এত যোগাড় হোল কখন্ রে নলি?

নলি। ও দাদামশায়, এসব পরামর্শ অনেকদিন থেকে

হোচ্ছে—কাল বাবাকে জেদ করে' ধরলুম যে আজ আমার মেয়ের বিয়ে হবেই হবে, তাই আজ হোল। পিসিমা, কাকিমা, কাল রাত্রে সবাই এসেছেন—আজ সকালে তোমাকে জব্দ কোরবো, তোমাকে একেবারে চোমকে দেবো বলে' কাল দাদা আর কাউকে তোমার সঙ্গে দেখা করতে দেয় নি।

বালা। দাদামশায়, বাবা বল্লেন—এত করছিস্ তবে একটা বাজনা আনা, সকালে বেশ মজা হবে—বাবা ভাববেন আমাদের বাড়ি আবার কার বিয়ে। পিসিমারা জোর করে' তোমায় বল্‌তে দিলে না—নইলে আমি কালই সব তোমায় বলে' দিতুম।

বিনয়। দাদামশায় কেমন বাসর সাজান' হোয়েছে দেখ্‌বে চল—দেখ্‌লে তোমার আবার বিয়ে করতে সাধ হবে।

আমি। তা বেশ তো ভাই, এক্‌লা পড়ে থাকি, অমনি নলির মেয়ের বিয়ের খরচে, আমারও একটা হোয়ে যাক্ না। আর কনেরও তো ভাবনা নেই—এমন সুন্দর নলি আছে—তাই তবে হোক্—কি বলগো মা জননি, জামাই করবে কি ?

আমার বাক্যের উত্তরস্বরূপে বধূমাতা সজোরে তিনবার শঙ্খধ্বনি করিলেন। "তা চল্ সব বারান্দায় চল্—তামাক খেতে খেতে, তোদের মেয়ের কোথায় বিয়ে হোল কি বৃত্তান্ত,সব শুনি।" তখন কাহাকেও কোলে লইয়া, কাহারও হাত ধরিয়া বারান্দায় আসিয়া বসিলাম। জোরে বাঁশী বাজিয়া উঠিল—বাজন্দারেরা জয় হোক্ বলিয়া, মাথা নাড়িয়া মহা উৎসাহে ঢোল বাজাইতে লাগিল।

বিনয় বড় ব্যস্ত—সে তাহার ছোটকাকাকে বলিল—"চল কাকা আমরা সভা সাজাইগে, এখানে মিছিমিছি থেকে কি হবে—আমাদের হাতে এখনো কত কায—আলো সব ঠিক

করতে হবে—মালা টাঙ্গাতে হবে, চল আমরা যাই।” তাহারা চলিয়া গেল।

নলি বড় মুস্কিলে পড়িয়াছে—মেয়ের বিয়ের আনন্দ তাহার হৃদয়ে ধরিতেছে না—সে আনন্দের ভাগী দাদামশায়কে না করিলে তার আর সোয়াস্তি নাই—এ বৃদ্ধ কাহাকেও উচ্ছ্বসিত করিতে পারুক না পারুক, কাহারও মুখে হাসি ফোটাইতে পারুক না পারুক, এখনো ঐ নলক-পরা কোঁকড়া-চুলে-ঘেরা ক্ষুদ্র মুখের ঈষৎ হাসিতে আপনি হাসিতে পারে। ঐ মুখখানি দেখিলেই জানিতে পারি যে এখনো আমি বাঁচিয়া আছি—আমি যে একটা জড়-পদার্থ নহি—আমাতেও যে এখনো মানুষের সুখদুঃখের রেশ আছে, তাহা কেবল ঐ দুটো বড় বড় চোখ দেখিলেই অনুভব করিতে পারি। এই বৃদ্ধের জড়-ভাব পাছে বৎসদের আমোদ-উচ্ছ্বাস উৎসাহ ও চঞ্চলতায় ব্যাঘাত করে তাই আমার একটু ভাবনা হইল, মুহূর্ত্তের মধ্যে কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইলাম, আমিও হাসিয়া হাসিয়া গান ধরিলাম

এত ফুল কে ফোটালে!
হাসি-তরঙ্গ, মরি, কে ওঠালে!

নলির গলা ধরিয়া যখন এই গান গাহিতেছিলাম তখন দেখিলাম জয়ন্ত ছলছল নেত্রে নলির দিকে চাহিয়া রহিয়াছে—মুখ ঈষৎ ম্লান। গান সমাপনান্তে মেয়ের ঘর-বর কেমন হইল নলিকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তখন নলি মুখখানা ভারি গম্ভীর করিয়া বলিল “সে কথা আর কি বলিব দাদামশায়, মেয়ের কি বিয়ে হয়—যে কাল পড়েছে—ভেবে ভেবে আমার পেটের ভাত চাল হোয়ে যাচ্ছিল—তা দাদামশায় কত খুঁজে খুঁজে সইএর ছেলের সঙ্গে ঠিক করেছি। সইএর ছেলেটী এম এ পড়্ছে। তা দাদামশায়

পাঁচ হাজার টাকা নগদ আর এই মেয়েকে দুশো ভরি সোণা, খাট বিছানা, রূপোর দানসামগ্রী, ফুলশয্যায় সোণার রেকাব গেলাস দিতে হবে। সই বলে যে, আমার চার পাশ করা ছেলে, আমি কি অত অল্প টাকায় রাজী হতুম, তবে তোমার সঙ্গে ছেলেবেলা থেকে সই পাতান—আর মেয়েটীও সুন্দর, জানা ঘর, তাই করলুম। তুমি আমার ছেলেকে নিয়ে আদর যত্ন করবে আর মেয়েকে দেওয়া তো একবারে দিলেই ফুরোয় না পাঁচবারে তখন পাঁচরকম করে দিও। সইও গায়ে হলুদ ভাল করে দেবে। মেয়েকে জড়োয়া ঝাপটা পাঠাবে পাঁচজন এয়োর পাঁচটা রূপোর সিঁদুরচুপড়ি দেবে। তা আমাদের আবার ফুলশয্যাতে রূপোর সিঁদুরচুপড়ি দিতে হবে। বাপ্‌রে! সেকালে বাপু এত ছিল না—দিন দিনই ফন্দি বাড়ছে। না জানি আরও কত হবে।”

বালা পাশে দাঁড়াইয়া মাঝে মাঝে দিদির কথার উপর কিছু বলিবার উদ্যোগ করিতেছিল কিন্তু দিদির একটানা স্রোতে সে থই পায় নাই—দিদি থামিবামাত্রই “শোন দাদামহাশয় ওদের মিছিমিছি টাকা—পাই পয়সায় পারা মাখিয়ে টাকা করেছে। আর পুঁথির গয়নাকে জড়োয়া বল্‌ছে।”

নলি হাসিয়া বলিল, “তা দাদামশায় এ ত আর সত্যির বিয়ে নয়—তবু দাদামশায় আমি সত্যিকার রূপোর দান দেব, তবে সত্যিকার সব নেমন্তন্ন হবে—সত্যিকার লুচিটুচি সব তো হচ্ছে, কেমন দাদামশায় ?”

জয়ন্ত। বাবা দেখেছ নলি আমাদের আজকাল বিয়ের পদ্ধতি, লেনাদেনা কেমন মাথার ভিতর ঠিক করে’ নিয়েছে, আমি আশ্চর্য্য হয়েছি যে ও কি করে’ কথাগুলো ঠিক ঠিক বলেছে, ও কোথায় শুনলে!

বাস্তবিক আমিও তাহাই ভাবিতেছিলাম। নলি অন্য বালিকা হইতে কতকটা বুদ্ধিমতী ও অনুকরণক্ষম তা আমি জানিতাম। কিন্তু ও যে এত সংগ্রহ করিতে পারে তা জানিতাম না। "কেমনরে নলি তুই এত বিয়ের কথা জানলি কেমন করে রে।"

"কেন দাদামহাশয় বৈশাখ মাসে যখন দিদির বিয়ে হোল তখন যে বড়পিসিমা তোমাকে কত কথা বল্লেন ?"

আমার মনে পড়িল সত্য সম্প্রতি আমার দৌহিত্রীর বিবাহ উপলক্ষে অনেক বাদানুবাদ হইয়াছিল বটে। এমন সময় ঐ বড়পিসিমা এসেছে, ঐ বড়পিসিমা এসেছে, ঐ দিদি এল, বৌমা এল, পুঁটী এল, কলরব পড়ে'গেল। আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা অভয়া আসিয়াই "হ্যাঁরে জয়, টাকা রাখতে বুঝি জায়গা পাসনি তাই মিছিমিছি গুচ্ছির টাকা খরচ করতে বসেছিস্। এতই যদি সাধ তো দেখ্, মেয়ের বে দে না, হলোও তো সাত আট বৎসরের, তোর বিয়ের সাধও মিটুক আর একটা কাজও হোক্—মিছিমিছি এত টাকা নষ্ট—আজও তোর ছেলেবুদ্ধি গেল না—যেমন তুই তেমনি বৌও উড়নচণ্ডি হোয়েছে।"

সর্ব্বমঙ্গলা। কেন দিদি বেশ তো হোচ্ছে, এ মাসে কি আর আমাকে পাঠাতো—ভাগ্যি নলির মেয়ের বিয়ে হোল তাই তো আসতে পেলুম। বৌ কেমন ঠিক সত্যিকার মতন বরণডালা সাজিয়েছে কেমন সব গোছগাছ করেছে—ওবাড়ির সব আসবে কেমন আমোদ হ'চ্ছে—দিদির সবতাতেই বকুনি।

অভয়া। না তা বকুবো কেন, তোরা পয়সাগুলো খোলার কুচি করে' ওড়াবি আমি চুপ করে' থাক্‌বো!

জয়ন্ত। দিদি যেমন করে' হোক্‌ আমোদ হোলেই হোল। দিদি পুতুলের বিয়েতে ভাবনা কিছু নেই—খাঁটি কেবল আমোদ টুকু পাওয়া যাচ্ছে—কিন্তু আজ যদি নলির বিয়ে হোত দিদি তা হোলে কি এত হাসি হাসতে পারতুম—তাতে আমোদ কোথায় ভাই—মনে ক'রে দেখ দিখি দিদি এত আদরের আমাদের নলি কার হাতে দিচ্ছি তা আমরা কিছুই জানতে পারবো না—তার সুখদুঃখে নলির সুখদুঃখ, তার পরে আরও কত ভাবনা—দেখ এই এখন আমরা সবাই আছি—নলির বিয়ের সময় যে সকলেই এমনি একত্রে আমোদ ক'রতে পারবো তারি বা ঠিক কি—কার কখন ডাক পড়বে দিদি তা তো আর আমরা জানিনে আর আমাদের হাতও নয়।

অভয়া। যা যা মিছে বকিস্‌নে—তোর সব কথাতেই পোড়া কথা আসে।

সর্ব্বমঙ্গলা। তা দিদি সত্যিই আমরা তো আর আকন্দর ডাল মুড়ি দিয়ে আসি নি—মরতে তো সবাইকেই হবে—তার কেউ আগে কেউ পরে—তাও আর পোড়া কথা কি।

আমি। ওরে বাছা আজ নলির মেয়ের বিয়ে, আজ কি ওসব অমঙ্গলের কথা বল্‌তে আছে—ওরে বাজনা বাজাতে বল্‌ না—বাজনা বুঝি চুপ করে' থাক্‌তে এসেছে।

বাজনা বাজিয়া উঠিল—নলির মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। বেচারা বাবা পিসিমার গম্ভীর তর্কবিতর্ক শুনিয়া ম্লানমুখে একবার এর মুখ একবার ওর মুখ চাহিতেছিল।

অভয়া। জয়, আমার জামাইবাড়ি নেমন্তন্ন করেছিস্‌ তো? আর জামাইটিকেও আন্‌তে পাঠাও, সে ছেলেমানুষ আমোদ আহ্লাদ করবে।

জয়। হ্যাঁ দিদি তা জামাই আনাব বইকি, ছেলেরা কতদিন ধরে' পুতুলের বিয়ে বিয়ে করছে, কাল আর শুনলে না, বল্লে কালই হবে—তাই তো এখনো কাউকে বলা হয় নি।

অভয়া। হ্যাঁ ভাই জামাইবাড়ি কাউকে পাঠাও, নতুন কুটুম্ব ভাল করে' যত্ন করতে হবে। তা হোলে ভাল নলির মেয়ের বিয়ের অছিলায় জামাইটি দেখ্‌তে পাব।

সর্ব্বমঙ্গলা। আঃ এতক্ষণে দিদির মুখে হাসি দেখা গেল—জামাই জামাই করেই দিদি সারা হয়ে গেল—পরের ছেলেকে অত কেন গা?

অভয়া। ওরে তোর যখন হবে তখন বুঝবি। এখনো মেয়ে হয়নি তার জামাই।

সর্ব্বমঙ্গলা। আমার মেয়ের আমি বিয়ে দেবই না—মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়ে ঘরে ছেলের মত রাখ্‌বো। বাবা! মেয়ের বিয়ে দিতে যে খোসামোদ করতে হয়—আমি অত পারবো না।

অভয়া। হ্যাঁ হ্যাঁ আমিও অমন এককালে কত কি বলতুম তার পর যাই সত্যি কাযের সময় এল—তখন যে-কে-সেই।

জয়ন্ত। দিদি, নলি কেমন গিন্নিপনা করে' বাবাকে বিয়ের সব খবর দিলে যদি শুন্‌তে তো অবাক্ হোতে। মমতাময়ীর বিয়ের সময় আমরা সব কথাবার্ত্তা কইতুম, সেই সব শুনে কেমন গুছিয়ে মনে রেখেছে।

"সে কিরে, আমরা তো কই কখনো দেখি নি যে নলি আমাদের কথা মন দিয়ে শুন্‌ছে! ওঁর বড় বুদ্ধি—বেঁচে থাকেন তো যার ঘরে যাবেন তার ঘর উজ্জ্বল হবে।"

"দিদি এস চল বৌদিদি ডাক্‌ছেন—কেমন কুলো বরণডালা

সাজান' হোয়েছে, দেখ্‌বে এস। চল নলি, বাবাকে সব এনে আমরা দেখাই।"

আমি। তোরা সব যা, মুখটুখ ধুয়ে কিছু খেয়ে দেয়ে আয়—আমিও আফিমটা খেয়ে গায়ে বল করে' নিই। আজ বড় খাটুনি মাথার উপর।

"ওগো কনের দাদা, আজ দু'সের দুধে হবে না—আজ দু'হাঁড়িছ ক্ষীর চাই।"

"তা বাবা আমায় বলা কেন—কনের মা ত তোমার কাছে দাঁড়িয়ে তাকে বল।"

"হাঁ হাঁ ওঁর কাছে দু'হাঁড়ীতে হবে না—ওঁর কাছে, পাঁচ হাঁড়ী।"

নলি। বল কি দাদামশায় তা হ'লে কেমন করে' কুলোবে, বাবা যে সবেমাত্র আট হাঁড়ি বই ক্ষীর ফরমাস্ দেন নি—তা হ'লে কেমন করে' হবে দাদামশায়—তুমি আর একদিন বেশি করে' খেও; আজ দাদামশায় বেশি খেও না।

জয়ন্ত। এইবার নলি জব্দ হোয়েছে, যা তোর আর ভাবতে হবে না—যাতে কুলোয় তাই হবে এখন। * * *

মহা সমারোহ। জামাই, নাতজামাই ভ্রাতৃবধূ সকলেই ক্রমে ক্রমে আসিলেন, সকলেরই হাসিমুখ সকলেই আমোদ আহ্লাদ করিতে লাগিলেন। বরণের সময় বধূমাতা নলির পার্শ্বে আমাকে দাঁড় করাইয়া আমাদের দুই জনকে বরণ করিলেন। কন্যাসম্প্রদানের সময় আমার দৌহিত্রী অমরাবতী আমাকে কন্যার পিতাস্বরূপে ধরিয়া লইয়া গিয়া কন্যা সম্প্রদান করাইল—কারণ নলির মেয়ে বটে, কিন্তু মেয়ের বাপের সম্পূর্ণ অভাব। আমাকে কেহ মালা পরায়, কেহ চাদর পরায়,

তাতে বড় হাসি। দেখিলাম জয়ন্ত হাসিয়া হাসিয়া বন্ধুদিগকে অভ্যর্থনা করিতেছে—নানারূপ হাস্যপরিহাসও চলিতেছে। বাসর-ঘরে গানবাজনাও হইতেছে—বিনয় দু’একটী গান জানে।

অনেক রাত্রে উৎসব শেষ হইলে আলোগুলি একে একে নিভিয়া আসিল, জনকোলাহল ক্রমে ক্রমে মন্দীভূত হইয়া আসিল, আমিও শ্রান্তভাবে বিছানায় পড়িলাম—আমাকে যে কাজ করিতে হইয়াছিল তাহা নহে—আমাকে যে আগ্রহ দেখাইতে হইয়াছিল, আমাকে যে হাস্যপরিহাস করিতে হইয়াছিল, আমাকে যে নিয়মিতাপেক্ষা অধিক পরিমাণে বাক্যব্যয় করিতে হইয়াছিল—তাহাতেই আমাকে অবসন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। আমি প্রতিদিন এক নিয়মেই কাটাই। নিয়মিত স্নানাহারের পর নলির হাতে মাথাটী সমর্পণ করিয়া দুপুরবেলা একটু নিদ্রা দিই। বৈকালে উঠানে ছেলেরা খেলা করে, চাহিয়া চাহিয়া দেখি—সন্ধ্যায় তাহারা ক খ গ ঘ পড়ে, নানারূপ ঝগড়াঝাটি করে, পাশের ঘর হইতে তাহা শুনি—পুত্রেরা আসিয়া দেশের সংবাদ কহেন তাহার দু’একটী উত্তর প্রত্যুত্তর করি। রাত্রে বধূমাতারা যখন তাঁহাদের সন্তানসন্ততি লইয়া আহার করাইতে আসেন তখন তাঁহাদের খবরাখবর লই ও তাঁহাদের পিতামাতাকে উল্লেখ করিয়া তাঁহাদের সন্তানসন্ততিদের লইয়া কিঞ্চিৎ রহস্যালাপ করিতে করিতে আহার শেষ করিয়া প্রশান্তচিত্তে ঘুমাইতে যাই। ইহার অধিক মনের উচ্ছ্বাস বা শরীরের বল আমার নাই।—ভাবিতে ভাবিতে জয়ন্তের কথা মনে পড়িল। বাস্তবিক আজ যদি নলিনীর বিবাহ হইত তো কত ভাবনা হইত। মনে আছে নিজের এক একটী

মেয়ের বিবাহ দিতাম আর তাহার পূর্ব্বে ও পরে কত ভাবনা হইত। এক্ষণে মন জড় হইয়া গিয়াছে এবং হাতে ক্ষমতা না থাকিলে মনের সকল ভাবই শমিত হইয়া আসে তাই আর সে সকল ভাবনা তত তীব্রভাবে নাই। হায়, আমার মধ্যমা কন্যা যখন স্বামীপ্রেমে বঞ্চিতা হইয়া ম্লানমুখে বেড়াইত তখন আমার কি করিতে না ইচ্ছা করিত? যত ভালবাসা দিলে সেই মুখে হাসি ফুটে আমি তাহাকে যে সকলি দিতে প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু পিতার স্নেহে যে সে ম্লানমুখে হাসি ফুটিবার যো নাই। সে যে ক্রমে প্রস্তরবৎ হইয়া আসিল—আমি দেখিলাম আমি কিছুই করিতে পারিলাম না। মাগো মহামায়া যে যাকে চায়, সে তাকে পায় না কেন মা! বুড়া হইয়া মরিতে চলিলাম তবু তোর রহস্য বুঝিতে পারিলাম না!

পরদিন দুপুর বেলা পাকাচুল তোলাইবার সময় নলির খোঁজ করিলাম—বালা আসিয়া বলিল "দিদির মেয়ে শশুরবাড়ি গেছে তাই দিদি কাঁদছে,দিদি আসবে না।" শুনিয়া স্থির থাকিতে পারিলাম না—নলির চক্ষে জল পড়িতেছে হায় কেন!—গিয়া দেখিলাম নলি কাঁদিতেছে—জয়ন্ত তাহাকে কোলে করিয়া বুঝাইতেছে "এই বুঝি তোমার বুদ্ধি আছে—পুতুলের জন্ত এত কান্না! তোমার অত পুতুল আছে একটা গেলই বা, অমনি পুতুল আবার হবে।"

কিন্তু নলির চক্ষের জল থামে না। আমি তাহাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া বিছানায় শোয়াইয়া বুকের কাছে আনিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "মেয়ে শশুরবাড়ি গেছে, তাই কাঁদছিস্ নলি?" সে মুখ ফুলাইয়া কহিল 'হুঁ'। কাঁদিয়া কাঁদিয়া রাত্রিজাগরণে কাতরা নলি ঘুমাইয়া পড়িল। উৎসব-কোলাহলান্তে বাটী নিস্তব্ধ হইয়াছে—সকলেই শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া বিশ্রাম করিতেছে—

আমারও স্বাভাবিক জড়ভাব ফিরিয়া আসিয়াছে—কিন্তু মনের আজ বিশ্রাম কই?

নলি পুতুলের বিবাহ দিয়াছে, বলিতেছে, মিছামিছি মেয়ে—বলিতেছে মিছামিছি বিবাহ দিলাম। কিন্তু কাঁদিতেছে সত্য। কিন্তু সত্য কোথায়? এই যে আমরা মানুষ বলিয়া নিজেরা অহঙ্কার করিয়া থাকি আমাদের মানুষত্ব কোথায়? নলির পুতুলকে নলি যেমন করিয়া নাড়েচাড়ে, যথা-ইচ্ছা তাহার প্রতি ব্যবহার করে, এমনি আমরাও কি এক আমাদের অজানিত কাহারও পুত্তলিকামাত্র নহি? সেই কন্যা কি তাঁহারই ইচ্ছা-মত আমাদের পরিচালিত করিতেছেন না? নলিও কি একটা পুতুল নহে? কে নলিকে হাসায়, কে কাঁদায়? মা, কে তুমি এই অনন্তকাল ধরিয়া এই সকল পুত্তলিকা লইয়া অনন্ত খেলা খেলিতেছ—কবে তোর বাল্যকাল ঘুচিবে, কবে তোর এ খেলা সাঙ্গ হইবে! ভাল, এই আমরা যে তোর পুতুল, আমাদের জন্যে কি কখনো তোর প্রাণ কাঁদে? নলির পুতুল ভাঙ্গিলে নলি কাঁদে, নলির মেয়ে শ্বশুরবাড়ি গেল, নলি কাঁদি-তেছে। কিন্তু তোর যে প্রতিদিন শত শত পুতুল ভাঙ্গিয়া যাইতেছে তাহাতে কি তোর চক্ষে এক ফোঁটা জল পড়ে? যখন তুই তোর শত শত পুত্তলিকাকে পুত্রশোকে কাতরা করিয়া কাঁদাইয়া আকুল করিয়া তুলিস তখন সে খেলায় তোর কি সুখ হয় একবার আমায় বল্ দেখি। তোকে জানি না, তোকে ত দেখিতে পাই না—কিন্তু তোর খেলা দেখিতে পাই। কোথায় তুই কি সুখে থাকিস্ তাই এই নিদারুণ খেলা খেলিস্ একবার আমায় বল্। না গো মা—জানি তা তুই বলিবিনে, তোর খেলা তুই বুঝি অনন্তকালই খেলিবি—তা খেল্, কেবল এই কথাটি শোন্ এই ভাঙ্গা পুতুলটা

নিয়ে আর খেলিসনে—এই প্রেমহীন বাসনাহীন জীর্ণ শার্ণ পুতুল-টাকে ফেলে দে—ভাঙ্গাপুতুল আর ভেঙ্গেভেঙ্গে খেলা করিসনে।

সাময়িক সারসংগ্রহ।

মধ্য আসিয়ায় রুষ।

কিছু দিন হইল সংবাদ আসিয়াছে রুষ সৈন্যাধ্যক্ষ কর্ণেল য়ানক্ সৈন্যসামন্ত লইয়া অক্ষসতীর হইতে পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন। এই সংবাদে আফগানিস্থানের আমীর ভীত হইয়াছেন; ইংরাজও নিশ্চিন্ত নহেন। এইসময়ে মধ্য আসিয়ায় রুষের গতিবিধি সম্বন্ধে দুই এক কথা বোধ হয় পাঠকদের অপ্রীতিকর হইবে না।

রুষ মধ্য আসিয়ায় রাজ্যপ্রসারণ ও সৈন্যসঞ্চালনে এত ব্যস্ত কেন? উদ্দেশ্য কি? রুষ নিজে বলেন, বাণিজ্যস্থাপন এবং অনাবিষ্কৃত স্থানসমূহের আবিষ্কার ব্যতীত আর কোন গূঢ় উদ্দেশ্য নাই। এই বিষয়ে ইংরাজ রাজনীতিবিদ্‌দিগের মধ্যে মতভেদ লক্ষিত হয়। একশ্রেণীর ইংরাজ রাজনীতিজ্ঞের দৃঢ় বিশ্বাস যে রুষের ভারত আক্রমণে কোন অভিলাষ নাই। আর একশ্রেণীর রাজনীতিজ্ঞ রুষের অর্থাভাব, আমীরের সহিত ইংরাজের বন্ধুত্ব এবং ভারতবাসীর অকপট রাজভক্তির উপর নির্ভর করিয়া অনেকটা নিশ্চিন্ত। আর এক শ্রেণী রুষভয়ে একান্ত ভীত। সময়ে অসময়ে ইঁহারা ঈশপ্-রচিত গল্পের বালকের মত "ঐ রুষ, ঐ রুষ" বলিয়া চীৎকার করিতেছেন। লড

এলেনবরার সময় হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত সমভাবে সমস্বরে আপনাদের ভীতিগ্রস্ত মনের পরিচয় দিতেছেন। বলা বাহুল্য ভারতে এই শ্রেণীর রাজনীতিজ্ঞের প্রাধান্য কিছু বেশী। এই শ্রেণী অনেক অনর্থ ঘটাইয়াছেন—নিষ্ফল আফগান যুদ্ধের মূল ইঁহারাই; ভারতে সৈন্যবৃদ্ধি ইঁহাদেরই জন্য; ইঁহাদেরই উত্তেজনায় আজিও গবর্মেণ্টকে উত্তরপশ্চিম প্রান্তে অনাবশ্যক দুর্গাদি নির্ম্মাণার্থে অজস্র অর্থব্যয় করিতে হইতেছে। ইঁহাদের উৎপাত না থাকিলে আজ বাটার দায়ে গবর্মেণ্টকে এতটা বিব্রত হইতে হইত না।

গত জুলাইমাসের নাইণ্টীন্থ্ সেঞ্চুরিতে আরমিনিয়স্ ভ্যামবরি সাহেব মধ্য আসিয়ায় রুষের কার্য্যকলাপ পর্য্যালোচনা করিয়া এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বে যে তিন শ্রেণীর রাজনীতিবিদ্‌দিগের কথা বলিয়াছি, প্রবন্ধলেখককে ঠিক তাহার কোন একটি শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে না বটে, কিন্তু তাঁহাকে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী এক শ্রেণীভুক্ত বলা যাইতে পারে। প্রবন্ধলেখক রুষের বাক্যে আদবেই বিশ্বাস করেন না; বরং ১৮৮৭ সাল হইতে আজ পর্য্যন্ত মধ্য আসিয়ায় রুষের কার্য্যকলাপ পর্য্যালোচনা করিয়া স্পষ্টই বুঝিয়াছেন যে, ভারত আক্রমণ ব্যতীত রুষের আর দ্বিতীয় অভিপ্রায় নাই। ১৮৮৭ সালে সীমা-কমিশন সীমা নির্দ্ধারণ করিয়া দিলে রুষসম্রাট প্রতিজ্ঞা করেন যে, তিনি কোন ক্রমেই রাজ্যের সীমারেখা অতিক্রম করিবেন না। ভ্যাম্বরি সাহেব বলেন যে যদিও সম্রাট স্বয়ং প্রকাশ্যভাবে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করেন নাই, তথাপি জেনারেল কোমারফের পরিবর্ত্তে জেনারল কুরোপাতকিন্‌কে ট্রেনস্‌কাস্পিয়ার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া উক্ত প্রতিজ্ঞাভঙ্গের

স্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন। কর্ণেল য়ানফ্ সৈন্যসামন্ত লইয়া পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন, প্রবন্ধলেখক প্রবন্ধ লিখিবার সময় সে সংবাদ প্রাপ্ত হন নাই। এই সংবাদ প্রাপ্ত হইলে বোধ হয় তিনি আর কালবিলম্ব না করিয়া রুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার পরামর্শ দিতেন। সম্প্রতি কিন্তু সংবাদ আসিয়াছে রুষসম্রাট কর্ণেল য়ানফের এই হঠকারিতার জন্য বিশেষ দুঃখিত হইয়াছেন। রুষসম্রাট তারযোগে কর্ণেল য়ানফ্কে ভৎসনা করিয়াছেন এবং শান্তিভঙ্গের কোন কার্য্য করিতে নিষেধ করিয়াছেন। ইংরাজ যে রুষের বন্ধু, সম্রাট য়ানফ্কে এই কথা স্মরণ রাখিয়া কার্য্য করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন। এই নিষেধ-আজ্ঞা প্রচার করিয়া সম্রাট যে আপনার সহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছেন ড্যামবরি সাহেবকেও বোধ হয় তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

এই সময়ে আমীরের সহিত ইংরাজের সদ্ভাব বজায় রাখা যে একান্ত কর্ত্তব্য তাহা সকলেই স্বীকার করেন। বর্ত্তমান আমীর আবদুর রহমন্ ইংরাজের নিকট বিশেষ উপকৃত এবং তিনি ইংরাজের বিশেষ বন্ধু বলিয়াও পরিচিত। ড্যামবরি সাহেবের আমীরের উপর তাদৃশ বিশ্বাস নাই; আমীর যে ইংরাজের আন্তরিক বন্ধু একথা তিনি স্বীকার করেন না। ড্যামবরি সাহেব যে ভারত গবর্মেণ্টের আফগান-নীতির সুখ্যাতি করিয়াছেন, সেই ভারত গবর্মেণ্টের আমীরের উপর কতকটা বিশ্বাস আছে বলিয়া বোধ হয়। বিশ্বাসের অভাব হইলে ভারত গবর্মেণ্ট আমীরকে সন্তুষ্ট করিবার বিশেষ প্রয়াস পাইতেন না। আমীরের বন্ধুত্ব বজায় রাখিবার একমাত্র উপায় আমীরের স্বরাজ্য শাসননীতির উপর কোন প্রকার হস্তক্ষেপ না করা।

মহামতি গ্ল্যাডষ্টোন প্রভৃতি রাজনীতিজ্ঞদিগের এই মত। ভ্যামবরি সাহেবের উপদেশ কিন্তু ঠিক ইহার বিপরীত।

ছয় বৎসর ধরিয়া ভারত গবর্মেণ্ট উত্তরপশ্চিম সীমা সংরক্ষণার্থে যে সকল কার্য্য করিতেছেন, ভ্যামবরি সাহেব সেই সকল কার্য্যের কেবলমাত্র সুখ্যাতি করিয়া ক্ষান্ত হয়েন নাই—তিনি ইংরাজকে ইংরাজ রাজ্যের বর্ত্তমান সীমা অতিক্রম করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, রুষ যেমন পশ্চিমে পারস্য-রাজ্যভুক্ত খোরাসন বা তাহার নিকটবর্ত্তী প্রদেশ দখল করিবার অভিপ্রায়ে আছেন, ইংরাজ তেমনি পারস্যপ্রদেশস্থ সিস্তান দখল করুন। সিস্তান ইংরাজের হস্তগত হইলে রুষ কোন ক্রমেই খোরাসন হইতে ভারতসীমায় আসিতে পারিবেন না। রুষ পামীর দখল করিয়াছেন; গিলগিটের মধ্য দিয়া কাশ্মীর আক্রমণ করা রুষের আর এক উদ্দেশ্য। ভ্যামবরি সাহেব বলেন, কাশ্মীরের উত্তরস্থ হানজা ও নাগর প্রদেশ ইংরাজ স্বরাজ্যভুক্ত করিলেই রুষের এ পথও বন্ধ হইবে।

ভ্যামবরি সাহেব রুষ সৈন্যাধ্যক্ষ কুরোপাতকিন্‌কে রুষ সীমারেখা অতিক্রমের চেষ্টা করিবার অপরাধে অপরাধী করিয়াছেন। তিনি কি করিয়া ইংরাজকে ঠিক সেই অপরাধ করিতে উত্তেজিত করিতেছেন তাহা আমরা বলিতে পারি না। আমাদের বিশ্বাস ইংরাজ যতদিন ন্যায় ও সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিবেন, ততদিন ভ্যামবরি সাহেবের এই উপদেশ কার্য্যে পরিণত হইবে না।

প্রবন্ধের উপসংহারে ভ্যামবরি সাহেব ভারতবাসীর রাজভক্তির উপর নির্ভর করিয়া বলিয়াছেন যে রুষের ভারতজয়ের আশা একান্ত দুরাশা। আমরা ভ্যামবরি সাহেবের এই কথার

সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। দুঃখের বিষয় আমাদের রাজপুরুষগণ ভারতবাসীর রাজভক্তির উপর তেমন বিশ্বাস করেন না—নহিলে অস্ত্র-আইনের আবশ্যক কি এবং বাঙ্গালীকে ভলন্টিয়ার করিতে এত অনিচ্ছা কেন?

———

কি রূপে গল্প তৈরি হয়।

"মনৃথ্লি প্যাকেট্" নামক বিলাতী মাসিক পত্রের জুলাই সংখ্যায় "কিরূপে গল্প তৈরি হয়" এই নামের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাহাতে ১৫ জন খ্যাতনামা উপন্যাস-লেখকের মতামত ব্যক্ত হইয়াছে। প্রবন্ধ লেখক তাঁহাদিগকে কতকগুলি প্রশ্ন লিখিয়া পাঠান, তাঁহারা সেই সকল প্রশ্নের যে উত্তর দিয়াছিলেন, সেই উত্তরগুলিই ঐ প্রবন্ধে সমালোচিত হইয়াছে।

প্রথম প্রশ্ন;—"গল্পের বীজাণু অথবা গল্পের মূল-বীজটি কি? কোন গল্প যখন লেখা হয়, তখন সেই গল্প ছবির আকারে, না অবস্থার আকারে, না সমস্যার আকারে, না অন্য কোন আকারে মনোমধ্যে প্রথমে উদয় হয়?"

ইহার উত্তরে ৫জন উপন্যাস-লেখক বলেন যে, সর্ব্বপ্রথমে সংকটাবস্থায় পতিত একটি কিম্বা কতকগুলি কাল্পনিক নায়ক তাঁহাদের মনোমধ্যে প্রথমে উদয় হয়—এই সংকট-সমস্যাটি কিরূপে পূরণ করা যাইবে প্রসঙ্গক্রমে আপনা-আপনিই তাহার উপায় মনে আসিয়া উপস্থিত হয়। আর চার পাঁচ জন উপন্যাস-লেখক বলেন, প্রথমে একটি সমস্যা তাঁহাদের মনে উদয় হয় এবং এই সমস্যা হইতে প্রসঙ্গক্রমে পরে বিবিধ চরিত্র-নায়ক তাঁহাদের মনে

আইসে। কেহ কেহ এরূপ বলেন যে, এই কাল্পনিক ব্যক্তি-বিশেষের চরিত্র অথবা কোন সমস্যা দৈবাৎ কাহারও কোনও কথা শুনিয়া, বা কাহারও মুখ দেখিয়া, কোন কবিতা বা প্রবচন পাঠ করিয়া মনে স্বতঃ উদয় হয়। তিনজন স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করেন যে, কোন বাস্তবিক স্থান-বিশেষ বা দৃশ্য-বিশেষ দেখিয়া গল্পের বিষয় তাঁহাদের মনে আপনা-আপনি উদয় হয়। একজন বলেন, হঠাৎ কোন কল্পিত দৃশ্য মনোমধ্যে উদয় হয়—কেন উদয় হইল তাহার কোন কারণ আপাতত খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, হয়তো কিছু কাল পরে তাহার একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় প্রশ্ন;—"গল্পের প্রারম্ভটা আপনা-আপনি সহজে আইসে, না চেষ্টা করিয়া আনিতে হয়?"

প্রায় ২৪ জনই উত্তরে বলিয়াছেন—"হাঁ"। এই উত্তর হইতে এইরূপ বুঝিতে হইবে যে কখন বা চেষ্টা করিয়া আরম্ভ করিতে হয়, কখন বা আরম্ভটা সহজে আপনা হইতে আইসে।

তৃতীয় প্রশ্ন;—"গল্পটি লিখিবার আগে মনে মনে সমস্তটাই কি পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত করিয়া লওয়া হয়—না,লিখিতে লিখিতে ক্রমশঃ উহা বিকশিত হইয়া উঠে?" চারিজন বলিয়াছেন, সমস্ত গল্পটা আগাগোড়া মনে মনে ঠিক্ করিয়া লওয়া হয়—কিন্তু আর কয়েক জন ভিন্নরূপ উত্তর দিয়াছেন। একজন লেখক বলেন, গল্পের কল্পিত নায়কেরাই সমস্যাটি পূরণ করে। কখন কখন কতকগুলি পৃথক্ পৃথক্ কল্পিত দৃশ্য তাহাদের মনশ্চক্ষুর সমক্ষে উপস্থিত হয়, কখন বা সমস্ত গল্পটাই আগাগোড়া ভাবিয়া-চিন্তিয়া স্থির করা হয়। আর একজন লেখক বলেন, ত্রিরাশি অঙ্কের ন্যায় সমস্যাটি আপনি পূরণ হইয়া আইসে। গল্পের প্রধান নায়কগুলি এবং গল্পের অবস্থা ও পরিণাম যদি পূর্ব্ব হইতে স্থির থাকে, তাহা

হইলে অন্তর্বর্ত্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা ও উপনায়কগুলির চরিত্র আপনা-আপনি বিকশিত হইয়া উঠে।

চতুর্থ প্রশ্ন ;—"যে রচনা চেষ্টা করিয়া করিতে হয় এবং যে রচনা আপনা-আপনি সহজে হয় এই উভয়ের মধ্যে রচনার উৎকৃষ্টতা সম্বন্ধে কোন প্রভেদ উপলব্ধি হয় কি না ?"—এই প্রশ্নের যে সকল উত্তর পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে এইরূপ অনুমান হয় যে অনিচ্ছাপূর্ব্বক জোর করিয়া গল্প লিখিতে বসিলে তেমন সুবিধা হয় না।

"গল্পের চরিত্র বর্ণনা দেখিয়া লেখকের চরিত্রের আভাস পাওয়া যায় কি না ?" এই প্রশ্নের উত্তরে একজন এইরূপ বলিয়াছেন ;—যে চরিত্র হৃদয়ের সহিত অঙ্কিত করা হয়, যে চরিত্রে লেখকের মমতা প্রকাশ পায় সে চরিত্র লেখকের অনুরূপ হওয়া অসম্ভব নহে।

"বাস্তবিক লোক-সমাজ হইতে তাঁহাদের গল্পের নায়ক সকল গৃহীত হয় কি না ?" অনেকেই এই প্রশ্নের সোজা উত্তর দেন নাই—একটু রঞ্জিত করিয়া বলিয়াছেন। একজন এই বলিয়াছেন যে, বাস্তব ঘটনারাশি হইতে কোন নায়ক নির্ব্বাচন করিয়া কল্পিত ঘটনার মধ্যে যদি তাহাকে নিক্ষেপ করা যায়, তাহা হইলে সেই পাত্রের চরিত্র তেমন স্বাভাবিক হয় না।

যাহা হউক, ১৫ জন উপন্যাস-লেখকের উত্তর হইতে এইটুকু সারসংগ্রহ করা যাইতে পারে যে, গল্প লিখিবার দুইটি প্রধান উপাদান—প্রথমতঃ—বিবিধ কল্পিত চিত্র মনোমধ্যে সহজে উদয় হয় এরূপ কল্পনা-শক্তি লেখকের থাকা চাই—দ্বিতীয়তঃ সেই কল্পিত চিত্রগুলিকে সাজাইয়া গুছাইয়া বেশ পরিপাটীরূপে কারিগরি সহকারে প্রকাশ করিবার শক্তি থাকা চাই।

বুদ্ধচরিত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

কপিলবস্তুর স্থান নির্ণয় এবং শাক্যবংশাবলী।

কপিলবস্তু অনেককাল হইল ধ্বংশ প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার অস্তিত্বের প্রমাণ এখন কেবল ভূমি খনন করিলে পাওয়া যায়। চীন দেশের পর্য্যটকেরা যখন এদেশে আসেন তখন তাঁহারা এই নগরের ভগ্নাবশেষ মাত্র দেখিয়াছিলেন। তাহার পর সহস্রাধিক বৎসর চলিয়া গিয়াছে। এখন সেইস্থানে পূর্ব্বকালের শাক্যমহিমার একটি চিহ্নমাত্র পাওয়া যায় না। ১৮৭৫ খ্রীঃ অব্দে কার্লাইল সাহেব ফাইজাবাদ হইতে যাত্রা করিতে করিতে হঠাৎ কপিলবস্তুর পূর্ব্বস্থান আবিষ্কার করিলেন। তৎসম্বন্ধে তিনি যে বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে হৃদয়ে একটি অপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার হয়। উক্ত নগর যে স্থানে স্থাপিত ছিল তাহাকে এখন ভুইলা গ্রাম বলে। ভুইলা একটি হ্রদের উপর স্থিত, তাহাকে ভুইলাতাল বলে। উহার অনতিদূরে একটি নদী প্রবাহিত হইতেছে এখনও দেখা যায়। বুদ্ধের সময়ে তাহাকে রোহিণী নদী বলিত। ভুইলার চতুর্দ্দিকে খনন করিতে করিতে চীনপর্য্যটক হিউন সাঙ যে সকল স্তূপ, বিহার এবং অট্টালিকার বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন তৎসমূহের ভগ্নাবশেষ ঠিক সেই সেই স্থানে লক্ষিত হয়। এই ভুইলা অর্থাৎ কপিলবস্তু ফাইজাবাদ অর্থাৎ অযোধ্যার ১২॥০ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বদিকে, বস্তি হইতে ৭॥০ ক্রোশ উত্তর এবং কাশী হইতে প্রায় ৫০ ক্রোশ উত্তরে। ইহা উত্তর-

পশ্চিমাঞ্চলের বস্তিবিভাগের মনসুরনগর পরগণার মধ্যে স্থিত। কুশিনগর হইতে কুমাউন পর্য্যন্ত যতটা বিস্তৃত দেশ দেখিতে পাওয়া যাইত শাক্যজাতি দ্বারা তখন তাহা পূর্ণ ছিল। শাক্যেরা অনেক কাল ধরিয়া এদেশের ক্ষত্রিয়জাতি ছিল। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যে মগধরাজ নন্দ পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন। তাহার বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই ক্ষত্রিয়দিগের তেজ এবং বীর্য্য হ্রাস হইয়া আসিতেছিল। সুতরাং যখন ক্ষত্রিয়েরা পরাস্ত হয় তখন দেশ রক্ষা করিবার জন্য বোধ হয় শাক্যেরা ক্ষত্রিয়দিগের স্থান অধিকার করিয়াছিল। পরে শাক্যজাতিও হীনপ্রভ হয়। খৃীঃ অব্দের ৫৭ বৎসর পূর্ব্বে বিক্রমাদিত্য ইহাদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া "শকারি" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহার পর রাজপুতজাতিরা ক্ষত্রিয় বলিয়া ভারতে গণ্য হইতে আরম্ভ করে। ভারতবর্ষে জাতিভেদ থাকাতে ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য নির্দ্দিষ্ট আছে। শূদ্রেরা নিকৃষ্ট কার্য্য, বৈশ্যেরা কৃষিকার্য্য এবং ব্যবসা, ব্রাহ্মণেরা শাস্ত্রালোচনা এবং ধর্ম্মচর্চ্চা করে। কিন্তু ইহারা আপনাপন কার্য্য করিতে থাকিলে দেশকে শত্রুর হস্ত হইতে কে রক্ষা করিবে! সুতরাং ক্ষত্রিয়জাতির প্রয়োজন হইল, এবং যখন ক্ষত্রিয়দিগের ধ্বংশ হইল তখনও কোন প্রকারের ক্ষত্রিয়জাতির আবশ্যক রহিল। বুদ্ধের পর শাক্যেরা সেই ক্ষত্রিয়জাতির পদ অধিকার করিয়াছিল, এবং শাক্যেরা পরাস্ত হইলে তাহাদিগের স্থানে রাজপুতেরা আসিয়া বসিল। পূর্ব্বকার ক্ষত্রিয়জাতি যে আর ভারতে নাই তাহার অতি অল্পমাত্র সন্দেহ আছে।

শাক্যেরা অনেককাল ধরিয়া কপিলবস্তুতে রাজত্ব করিয়াছিল। বৌদ্ধ লেখকদিগের বিবেচনায় দুইলক্ষ রাজা ক্রমান্বয়ে

সেই দেশের সিংহাসনে বসিয়াছিল। ইহা যে অত্যুক্তি তাহার আর সন্দেহ নাই। কালক্রমে অবশেষে জয়দেব নামে একজন রাজা হইলেন। জয়দেবের পুত্র সিংহহনু। তাঁহার গণ্ডদ্বয় সিংহের ন্যায় ছিল বলিয়া তাঁহার সিংহহনু নাম হইয়াছিল। এই রাজার চারিপুত্র এবং চারি কন্যা ছিল। * পুত্রদিগের নাম শুদ্ধোদন, শুক্লোদন, দ্রোণোদন এবং অমৃতোদন, এবং কন্যাদিগের নাম শুদ্ধা, শুক্লা, দ্রোণা এবং অমৃতা। তন্মধ্যে শুক্লোদনের দুইপুত্র আয়ুষ্মৎ জিন এবং শাক্যরাজ ভদ্র; দ্রোণোদনের দুইপুত্র মহানামন এবং আয়ুষ্মৎ অনিরুদ্ধ; অমৃতোদনের দুই পুত্র আনন্দ এবং দেবদত্ত। এতদ্ব্যতীত শুদ্ধার পুত্র সুপ্রবুদ্ধ, শুক্লার পুত্র মল্লিক, দ্রোণার পুত্র সুলভ এবং অমৃতার পুত্র কল্যাণবর্দ্ধন।

আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে অম্ব রাজার চারি পুত্র এবং পাঁচ কন্যা কপিলবস্তু স্থাপন করিয়াছিলেন। কন্যাদিগের মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠা তিনি কুষ্ঠরোগগ্রস্তা হইয়া বনে প্রস্থান করিয়াছিলেন। তিনি তথায় একটি বৃক্ষতলায় লুক্কায়িত থাকিতেন। একদিন ব্যাঘ্রদর্শনে ভীতা হইয়া চীৎকাররবে সকলকে ডাকিতে লাগিলেন। ঠিক সেইসময় কাশীর অধিপতি রাম কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হইয়া সেই বনমধ্যে আশ্রয় লইয়াছিলেন। তিনি অম্বরাজার দুহিতার ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া অবিলম্বে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিলেন। অবশেষে উভয়ে কোন বৃক্ষমূল ভক্ষণ করিলে তাঁহাদিগের ব্যাধি দূর হইল। তৎপরে তাঁহারা উভয়ে উদ্বাহশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইলেন। কিন্তু তাঁহারা কাশীতে প্রত্যাগমন করিলেন না। কোলি বলিয়া একটি নূতন নগর স্থাপন করিয়া তাঁহারা তথায় সুখে রাজত্ব করিতে লাগি-

* কেহ কেহ বলেন পাঁচ পুত্র ও দুই কন্যা ছিল।

লেন। ব্যাঘ্র দেখিয়া রাণী ভয় পাইয়াছিলেন বলিয়া এই নগরকে লোকে ব্যাঘ্রপুর বলিয়াও ডাকিত। কিছুদিন পরে কপিলবস্তুর রাজারা জানিতে পারিলেন যে কোলিনগরের রাণী তাঁহাদিগের ভগ্নী। শাক্যেরা অন্য গোত্রে বিবাহ করিলে পাছে তাহাদিগের কোন কলঙ্ক আসে এই আশঙ্কায় তাহারা আপনাদিগের বংশের ভিতর বিবাহপ্রথা প্রচলিত করিয়াছিল। এই সময় হইতে কপিলবস্তুর রাজবংশের কেবল ব্যাঘ্রপুরের রাজবংশের সহিত বিবাহ চলিতে লাগিল। তাহারা অন্য কোন বংশে পাত্র কিম্বা পাত্রী সমর্পণ করিত না।

ব্যাঘ্রপুর এখনকার কুয়ানা নদীর তটে স্থিত। কুয়ানা এবং রোহিণী একত্র হইয়া এখনকার ঘাঘরা নদীতে মিলিত হইয়াছে। কপিলবস্তু হইতে ৫।৬ ক্রোশ পূর্ব্বে ব্যাঘ্রপুর। ব্যাঘ্রপুরে বরাহ অবতার হইয়াছিল বলিয়া এই নগর বরাহক্ষেত্র বলিয়াও বিখ্যাত আছে।

সিংহহনুর ভগ্নী ব্যাঘ্রপুরের রাজা অঞ্জুশাক্যের সহিত বিবাহ করেন। তাঁহার দুই পুত্র এবং দুই কন্যা হয়। পুত্রদ্বয়ের নাম সুপ্রবুদ্ধ এবং দণ্ডপাণি, দুই কন্যার নাম মহামায়া এবং মহাপ্রজাপতি। সিংহহনুর পুত্র শুদ্ধোদন ক্রমান্বয়ে এই দুই ভগ্নীকে বিবাহ করেন। মহাপ্রজাপতির গর্ভে নন্দ জন্মগ্রহণ করেন এবং মহামায়াদেবীর পুত্র প্রসিদ্ধ বুদ্ধদেব।

তৃতীয় অধ্যায়।

বিদেশ সকলের অবস্থা।

বুদ্ধের জন্ম বর্ণনা করিবার পূর্ব্বে তখনকার দেশবিদেশের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা একবার আলোচনা করা উচিত।

কেননা মহাপুরুষেরা যখন তখন পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন না। কোন বিশেষ অভাব হইলে কিম্বা পৃথিবী ঘোর পাপভারে আক্রান্ত হইলে সেই ভার মোচন করিবার জন্ত তাঁহারা জন্মগ্রহণ করেন। সেই জন্য কোন ধর্ম্মসংস্থাপকের জীবন বর্ণনা করিতে গেলে তিনি কোন্ সময়ে জন্মগ্রহণ করিলেন, দেশের অবস্থা তখন কিরূপ ছিল এবং লোকদিগের আচার ব্যবহার বা কেমন ছিল, এ সকল বিষয় আমাদিগের জানা উচিত।

ভারতের কোন ইতিহাস নাই। সুতরাং এই সকল ব্যাপারের পরিষ্কার সমাচার কোথাও পাইবার সম্ভাবনা নাই। তবে বৌদ্ধদিগের ধর্ম্মসাহিত্য সুপ্রচুর আছে। তাহা এক সমুদ্র সদৃশ। যতবার তাহাতে মগ্ন হই না কেন, কোন-না-কোন বহুমূল্য রত্ন পাইবই পাইব। এইরূপে পরিশ্রম করিয়া, বহু আয়াসে, বুদ্ধের সম্বন্ধে কতকগুলি সংবাদ আহরণ করা যায়।

বুদ্ধের জন্ম এবং মৃত্যুর তারিখ অভ্রান্তরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে কি না বলিতে পারি না। এ বিষয়ে সিংহলে এক মত, তিব্বতে অন্যরূপ মত, নেপাল প্রভৃতি স্থানে আর এক মত এবং ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের মধ্যে সম্পূর্ণ বিপরীত মত। তন্মধ্যে সিংহলদেশের মতটা অনেক পরিমাণে সত্য বলিয়া বোধ হয়। ইউরোপীয়দিগের মতই আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু তাঁহাদিগের একটি দোষ আছে। এবং সেই দোষে তাঁহাদিগের সমুদয় গণনা দূষিত বলিয়া বোধ হয়। সে দোষটি এই যে তাঁহারা বিধিমতে ভারতের ঘটনাগুলিকে খ্রীঃ অব্দের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কিম্বা যথেষ্ট পরে ঘটিয়াছিল বলিয়া প্রমাণ করিতে চাহেন। যাহাতে এদেশের প্রাচীনত্বের অহঙ্কার চূর্ণ হইয়া যায় ইহাই

তাঁহাদিগের চেষ্টা; সেই জন্য তাঁহাদিগের গণনাগুলি আমাদিগের অবলম্বন করিতে হইলেও আমরা সে সমুদয়ে একেবারে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না।

বুদ্ধদেবের মৃত্যুর চৌদ্দটি তারিখ বৌদ্ধ পুস্তক মধ্যে পাওয়া যায়। যথা, খ্রীঃ অব্দের ২৪২২, ২১৪৮, ২১৩৫, ২১৩৯, ১৩১০, ৭৫২, ৬৫৩, ৫৪৩, ৮৮০, ৮৩৭, ৫৭৬, ৮৮৪, ১০৬০, ৮৮২ বৎসর পূর্ব্বে। ইহাদিগের মধ্যে অতিশয় পূর্ব্বতম তারিখগুলি আমরা নির্ভয়ে অগ্রাহ্য করিতে পারি। খ্রীঃ অব্দের ছয় শত কিম্বা পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে যে তারিখ কয়েকটি দেওয়া হইয়াছে তাহা গ্রহণ করিতে আপাততঃ কোন দোষ নাই। সিংহলদেশের গণনা অনুসারে বুদ্ধের নির্ব্বাণ খ্রীঃ পূর্ব্ব অব্দ ৫৪৩ বৎসরে হয়। বুদ্ধ ৮০ বৎসর বাঁচিয়াছিলেন। সুতরাং এই মতে তিনি ৬২৩ পূর্ব্ব খ্রীঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যদি ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাই যে সেই সময়ে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে অনেক প্রকার স্মরণীয় ঘটনা ঘটিয়াছিল।

১। একেশ্বরবাদী ইহুদিরা নানা পাপে লিপ্ত হইয়া অবশেষে সকল বিষয়ে তেজোহীন হইয়া পড়িয়াছিল। এতদবস্থায় ব্যাবিলনের রাজা নেবুকাডনেজর তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া তাহাদিগের দেবনগর জেরুসালেমকে একেবারে ভূমিসাৎ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তাহারা বন্দী হইয়া বিদেশে প্রাণত্যাগ করে। সেই পর্য্যন্ত ইহুদিরা আর স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে নাই। এক রাজার হস্ত হইতে আর এক রাজার হস্তে পড়িয়া পরাধীন অবস্থাতে দিনপাত করিতে হইয়াছে। পারসীক, গ্রীক এবং রোমকরাজারা আসিয়া ক্রমান্বয়ে তাহাদিগকে দাসত্বশৃঙ্খলে

বদ্ধ করে, এবং অবশেষে রোমকরাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহিতার জন্য তাহাদিগকে দেশচ্যুত হইয়া ইতস্তত ছড়াইয়া পড়িতে হয়। আজপর্য্যন্ত তাহাদিগের স্বদেশ বলিয়া একটি স্থান নাই। যে ঘটনাবলী অবলম্বন করিয়া ঈশার জন্ম এবং মৃত্যু হয় এবং যে যে কারণে ঈশার ধর্ম্ম মানবধর্ম্ম হইতে পারিয়াছিল, সেই ঘটনা সকলের সূত্রপাত বুদ্ধের কিয়ৎকাল পূর্ব্বে কিম্বা পরে হইয়াছিল।

২। পারস্যদেশের ধর্ম্মসংস্কারক জোরোয়াস্তার এই সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার আবির্ভাবে ইরাণ আবার পুনর্জীবিত হয় এবং তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্ম আমরা আজও বোম্বাই প্রদেশস্থ পারসীদিগের মধ্যে দেখিতে পাই।

৩। চীনদেশে মহাজ্ঞানী কনফ্যুসিয়াস্ এই সময়ে লোকদিগকে নূতন ধর্ম্ম এবং নূতন শাসনপ্রণালী প্রদান করেন।

এই ঘটনাগুলি সামান্য ঘটনা নহে। আমরা দেখিতেছি যে খ্রীঃ অব্দের পূর্ব্বে চতুর্থ পঞ্চম এবং ষষ্ঠ শতাব্দী পৃথিবীর পক্ষে এক প্রকার নবযুগ হইয়াছিল। কেবল ভারতে নহে, সকল দেশে নবজীবন আরম্ভ হইয়াছিল। মনুষ্যসমাজের নিয়মই এইরূপ। কখন্ নিদ্রাবস্থা, কখন জাগ্রত ভাব। ঘোর অজ্ঞান-অন্ধকাররাশি ভেদ করিয়া যখন নূতন সত্যসূর্য্য প্রকাশিত হয় তখনই পৃথিবীতে নব তত্ত্ব, নব শাস্ত্র, নব বিজ্ঞানের অভ্যুদয় হয়, তখনই মানুষ মানুষকে ভ্রাতা বলিয়া চিনিতে পারে, তখনই পরমেশ্বরের মুখ মানুষ প্রত্যক্ষরূপে দেখিতে পায় এবং তখনই পৃথিবীর নূতন শ্রী হয়।

চতুর্থ অধ্যায়।

স্বদেশের অবস্থা।

বিদেশ হইতে স্বদেশে আসিয়া দেখি যে এখানেও নবজীবনের আয়োজন সমুদয় প্রস্তুত। সে সময়কার ধর্ম্ম পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাই যে তখন বৈদিক ধর্ম্মের পূর্ণ প্রাদুর্ভাব ছিল। পৌরাণিক ধর্ম্ম আসিতে আরম্ভ হইয়াছে; কিন্তু পুরাণের দেবদেবীদিগের তখনও প্রতিষ্ঠা হয় নাই। লোকেরা ইন্দ্র, বরুণ, কুবের, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, এবং শিবের পূজা করিত। কিন্তু দুর্গা, কালী, কার্ত্তিক, গণেশ, স্বরস্বতী এবং লক্ষ্মী তখনও লোকের হৃদয়ে স্থান পায় নাই। কৃষ্ণপূজার আরম্ভ হইয়াছিল কি না বলিতে পারি না; তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে কৃষ্ণের প্রতিমূর্ত্তি-পূজার তখন সৃষ্টি হয় নাই।

তেত্রিশ কোটি দেবতা তখনও ভারতের গগনে উদয় হয় নাই। বৈদিক ধর্ম্ম, বৈদিক আচারব্যবহার তখন পূর্ণমাত্রায় প্রতিষ্ঠিত ছিল। ঋষিমুনিরা বনের মধ্যে, পর্ব্বতের মধ্যে তপস্যা করিতেন। তন্মধ্যে এক একজন অসাধারণ ধীসম্পন্ন যোগী অগণ্য শিষ্য সমভিব্যাহারে লইয়া দেশেদেশে ভ্রমণ করিতেন। সাধনের কঠোর নিয়ম সকলই বর্ত্তমান ছিল। যাগ, যজ্ঞ, নিত্যনৈমিত্তিক বেদের মতে সম্পাদিত হইত। তবে পূর্ব্বের মত রাজসূয় বা অশ্বমেধ যজ্ঞ প্রচলিত ছিল না। ইহার কারণ বোধ হয় এই যে, তখন এমন কোন প্রবল পরাক্রান্ত নৃপতি ছিলেন না যিনি অন্য রাজাদিগকে অধীনস্থ করিতে সাহস করিতেন। তখনকার ধর্ম্ম কার্য্যকলাপেই বদ্ধ ছিল। নীতিসঙ্গত যুক্তিসঙ্গত ধর্ম্ম তখন ছিল বলিয়া বোধ হয় না। পূজা করিলে, মন্ত্র পাঠ

করিলে, অনাহারে যাগযজ্ঞ করিলে মুক্তি হয় এই বিশ্বাস সকলকার ছিল। কিন্তু মন ভাল করা উচিত, পাপ থাকিলে মুক্তি হয় না, পুণ্যই স্বর্গের সোপান এ প্রকার মত তখন প্রচার হয় নাই।

ভারতে মূর্ত্তিপূজা কখন আরম্ভ হইয়াছিল তাহা বলা যায় না। তবে বুদ্ধের সময় দেবদেবীগণের প্রতিমূর্ত্তি-পূজা হইত ইহার প্রমাণ যথেষ্ট পাই। এদেশে বিশুদ্ধ একেশ্বরতত্ত্ব (Theism.) কখন প্রচলিত ছিল কিনা বলিতে পারি না। তবে পূর্ণব্রহ্ম লইয়া অনেক চর্চ্চা হইত এবং পণ্ডিতেরা ব্রহ্মধ্যান ব্রহ্মজ্ঞান এবং ব্রহ্মসাধন লইয়া অনেক বিচার করিতেন। তাঁহাদিগের সহিত মূর্খদিগের অনেক কাল হইতে বিচ্ছেদ হইয়া গিয়াছিল। ব্রহ্মতত্ত্ব পণ্ডিতদিগের জন্য ছিল এবং দেশীয় ধর্ম্ম, লৌকিক আচার সকল সামান্য লোকদিগের জন্য হইল। প্রতিমূর্ত্তিপূজার সৃষ্টি এই কারণেই হয়। শাক্যমুনি যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন তৈত্তিরীয় ছান্দোগ্য প্রভৃতি উপনিষদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং উপনিষদের পর বৌদ্ধধর্ম্মের আরম্ভ হইয়াছিল ইহা বিশ্বাস করিতে পারা যায়। এদিকে যেমন উপনিষদ সকল ব্রহ্মের স্বরূপ লইয়া নিযুক্ত ছিল, আর এক দিকে দর্শনশাস্ত্র সকল জগতের উৎপত্তি, আত্মার স্বরূপ, জীবাত্মা ও পরমাত্মার প্রভেদ, জড়বাদ ও প্রকৃতিপুরুষতত্ত্ব লইয়া ব্যস্ত ছিল। বুদ্ধের পূর্ব্বেই যোগ, মীমাংসা, বৈশেষিক, ন্যায় এবং সাংখ্য দর্শন সকল রচিত হইয়াছিল। সুতরাং যখন বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন তখন ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় সমুদয় প্রশ্নই এক প্রকার উত্থাপিত হইয়াছিল। দর্শনসম্বন্ধে বিবিধ দুরূহ প্রশ্ন সেই সময়েই উত্থাপিত হয় এবং তাহাদিগের মীমাংসা সেই সময়েই হয়।

তাহার পর আজপর্য্যন্ত তৎসম্বন্ধে একটি নূতন কথা কেহ বলিতে পারেন নাই এবং দার্শনিক উন্নতি এক পদ মাত্র অগ্রসর হয় নাই। সেই তখন যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহার পর টীকা, ব্যাখ্যা, ভাষ্য প্রভৃতি ব্যতীত আর অন্য কোন কথা নাই। গ্রীসদেশে আরিষ্টটল্ এবং প্লেটো দর্শনসম্বন্ধে যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহার পর যেমন আজ পর্য্যন্ত ইউরোপে কেহ একটি নূতন কথা বলিতে পারেন নাই, ভারতে কপিল, গৌতম, কণাদ, জৈমিনি প্রভৃতি দার্শনিকেরা যাহা করিয়া গিয়াছেন তাহার উপর একটি নূতন কথা আজ পর্য্যন্ত কেহ বলিতে পারেন নাই। বুদ্ধও তাঁহার ধর্ম্ম দর্শন সম্বন্ধে একটি নূতন তত্ত্ব প্রচার করিতে পারেন নাই। পুনর্জ্জন্ম এবং কর্ম্মফলতত্ত্ব এ দুইটি ভারতের নূতন কথা। এ দুইটি কথাই বৌদ্ধধর্ম্মের ভিত্তিস্বরূপ ছিল। কর্ম্মফলনিয়ম সত্য বলিয়াই তিনি দেবদেবী, জাতিভেদ, স্বর্গ নরক প্রভৃতি ব্যাপার মানিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের এ সকল কথা কিছুই নূতন নহে। ইহাতে নূতন কি ছিল তাহা আমরা পরে আলোচনা করিব। তবে এখন এইমাত্র বক্তব্য যে বুদ্ধকে দর্শনসম্বন্ধে নূতন মত কিছুই সৃষ্টি করিতে হয় নাই। তাঁহার পূর্ব্বে বিশ্বের মূলতত্ত্বগুলি দর্শনসমূহে আলোচিত হইয়া গিয়াছিল। উপনিষদে ব্রহ্মতত্ত্ব স্থিরীকৃত হইয়াছিল। প্রতিমূর্ত্তি-পূজা সম্পূর্ণরূপ বর্ত্তমান ছিল। তাঁহার পূর্ব্বে মহাভারতও রচিত হইয়া গিয়াছে, যেহেতু মহাভারতের দু' একটি শ্লোক আমরা ললিতবিস্তরে উদ্ধৃত দেখিতে পাই।

বুদ্ধের সময় ভারতে কোন বিস্তৃত সাম্রাজ্য ছিল না। সমস্ত দেশটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। একটি নগর—কতিপয় গ্রাম লইয়া একজন রাজার রাজত্ব ছিল। যুধিষ্ঠিরের পর আর

কোন নৃপতি ভারতবর্ষকে একচ্ছত্রের অধীন করিতে পারিয়াছিলেন তাহা বোধ হয় না। বুদ্ধের আবির্ভাবের সময় আর্য্যভারতই বিদ্যমান ছিল। তখন পাণ্ডবেরা হস্তিনাপুরে রাজত্ব করিতেছিলেন, কোশল এবং বিদেহ রাজ বর্ত্তমান ছিল এবং এতদ্ব্যতীত বৈশালি মথুরা এবং মিথিলা দেশে বহু পুরাতন রাজবংশ সকল জীবিত ছিল। ক্ষত্রিয়দিগের তখন পর্য্যন্ত পূর্ণ আবির্ভাব ছিল। পুরাতন আর্য্যদেশ, অর্থাৎ রামায়ণ এবং মহাভারতের আর্য্যদেশ তখন সশরীরে বর্ত্তমান। বুদ্ধের পর নূতন সময় আসিয়া পুরাতনকে বিনাশ করিল। কিন্তু তাঁহার জন্মকালে এদেশের লোকেরা সেই পুরাতন বায়ু সেবন করিতেছিল। সেই ধূপধূনার গন্ধ, সেই মন্ত্রপাঠের আড়ম্বর সেই পর্ব্ব সকলের প্রাদুর্ভাব বুদ্ধ আসিয়া সমস্তই দেখিলেন। তাঁহার সময়ে দেশের অবস্থা এইরূপ ছিল। কিন্তু তাঁহার পরে একেবারে কি পরিবর্ত্তন হইল!

আর সে পাণ্ডবেরা রহিল না। পুরাতন রাজবংশ সকল লুপ্ত হইয়া গেল। ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল হইলে শূদ্রেরা রাজত্ব করিতে লাগিল। মদ্যপানপ্রথা পূর্ব্বে অতিশয় প্রচলিত ছিল, এখন তাহা বন্ধ হইল এবং জীবহত্যা গিয়া নিরামিষ ভোজন দেশের নূতন আচার হইল। ব্রাহ্মণ পুরোহিতেরা হীনপ্রভ হইলে বৌদ্ধ শ্রমণ এবং অর্হতেরা আসিয়া তাহাদের স্থান গ্রহণ করিল। সন্ন্যাসীদিগের আর তেমন আদর রহিল না, তাহাদিগের স্থান ভিক্ষু ভিক্ষুণীরা অধিকার করিল। আর পুরাতন প্রথা মতে কেহ মন্দির নির্ম্মাণ করিতে চাহিত না—এখন নূতন ভাবে স্তূপ ও বিহার সকল নির্ম্মিত হইতে লাগিল। দেবদেবীদিগের প্রতিমূর্ত্তির আর সে আদর রহিল না, তাহাদিগের পরিবর্ত্তে বুদ্ধের

প্রতিমূর্ত্তি চারিদিকে বিরাজ করিতে লাগিল। নূতন প্রকারে গৃহনির্ম্মাণ প্রথা প্রচলিত হইল এবং নূতন ভাস্করবিদ্যা আবিষ্কৃত হইয়া দেশকে নূতন শ্রী ও সৌন্দর্য্যে বিভূষিত করিল। জাতি-ভেদ প্রথা কিছু কালের জন্য দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। আর্য্যধর্ম্ম যেমন দেশীয় ধর্ম্ম ছিল বৌদ্ধধর্ম্ম তেমনি মানবধর্ম্ম হইল। এদেশে কোন কালে ধর্ম্মপ্রচার প্রথা ছিল না—কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার-কেরা দেশ বিদেশে গিয়া তাহার মহিমা প্রচার করিতে লাগিলেন। রাজারা বেদ উচ্চারণ না করিয়া বৌদ্ধসূত্র এবং বিনয় উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। পুরাতন পর্ব্ব গিয়া বুদ্ধের রথযাত্রার সৃষ্টি হইল। এই রথযাত্রা এখন জগন্নাথ দেবেরই আছে। কিন্তু ইহার আরম্ভ বৌদ্ধদিগের নিকট হইতে হয়।

যখন মহাপুরুষেরা জন্মগ্রহণ করেন তখন তাঁহারা পৃথিবীকে একভাবে দেখেন, তাহার পর ইহলোক হইতে বিদায় লইবার সময় তাঁহারা সেই পৃথিবীকে নূতন বেশে সজ্জিত দেখিয়া যান। বুদ্ধদেবের জন্ম হইবার সময়ে ভারতের অবস্থা কি ছিল তাহা বর্ণিত হইল। তাঁহার জীবিতাবস্থায় এমন কি শক্তি আসিল যাহার প্রভাবে ভারতকে আবার নূতন আকার ধরিতে হইল, এই প্রশ্নের উত্তর দানে আমরা এখন নিযুক্ত হইলাম।

শিশুর আদর।

কে চায় নলিন্ সূর্য্যমুখী ?
কে চায় কুমুদ হাস্যমুখী ?
বাসর ঘরের কনের মত
বরুণ কালের বধূর মত !

কে চায় অশোক, আগাগোড়া,
রাঙা জামাজোমায় মোড়া ?
লাল পাগ্‌ড়ি, লাল চোগা,
পুলিস চৌকির দারোগা !

কে চায় কদম ? যায় উড়ে
আঙ-রাখাটি ফুর্‌ফুরে !
অঙ্গ ভেজে, হায় তবু
মহা সৌখীন্ ফুল বাবু !

(আমি) চাই মালতি, বকুল জাতি ;
চাই অতসি, রূপের ভাতি !
খোকার মত !
খুকির মত !

(আমি) চাই সিউলি, টুক্‌টুকে ;
সেঁউতি, জুঁই, ফুট্‌ফুটে ;
যাদুর মত !
ধোনার মত !

পূজার ছুটি।

গাড়ী ষ্টেশনের পর ষ্টেশনে থামিতে থামিতে আমার গন্তব্য ষ্টেশনে উপস্থিত হইল। আমি নামিয়া পড়িলাম।

রাত্রি তখন আটটা। ষ্টেশনের বাহিরে আমাদের গ্রামস্থ তিনটী স্কুলের ছাত্রের সঙ্গে দেখা হইল; একজন কিশোরবয়স্ক,অপর দুইটী বালক। তাঁহারা তিন জনেই এক পরিবারভুক্ত। কলিকাতায় থাকিয়া পড়াশুনা করেন, সম্প্রতি ছুটিতে বাড়ী যাইতেছেন।

আমরা চারিজনে একখানি গাড়ী ভাড়া করিব স্থির হইল। বহুত গ্রাহক, এদিকে গাড়ী কম, গাড়োয়ানদের সুতরাং পোহা-বারো। অন্য সময় তাহারা ছুটিয়া আসিয়া হাতের ব্যাগ বহিয়া গাড়ীতে লইয়া যায়, আজ আর তাহাদের মাটীতে পা পড়ে না; তারা কোচবাক্সে গম্ভীরভাবে অমনি বসিয়া রহিল। কিন্তু গরজ বড় বালাই, আমরা নিজের দায়ে অগত্যা মহম্মদের সেই উপদেশ-বাক্য স্মরণ করিলাম। গাড়োয়ানেরা অগ্রসর হয় না দেখিয়া, আমরাই শেষ গাড়ীর কাছে হাজির হইলাম। অন্য সময় দুই টাকার মধ্যেই গাড়ী মিলে কিন্তু আজ আর কেহ পাঁচ টাকার কমে যাইতে স্বীকার হইল না। আমরা তাই স্বীকার করিয়া গাড়ীতে উঠিলাম,গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিল—পক্ষীরাজ-দ্বয় গজেন্দ্রগতিতে ছুটিলেন। তাহাদের প্রতি পদক্ষেপে একটা গভীর ঔদাস্য ও নির্লিপ্ততার ভাব প্রকাশ পাইতেছিল। হায়, আগে বুঝি নাই এই অশ্বিনীকুমারযুগলেরও গাড়োয়ানদের মত পায়াভারি হইয়াছে। গাড়োয়ানের পায়াভারি গ্রাহক দেখিয়া, আর ইহাদের ক্ষেপ বহিয়া বহিয়া।

যাইহোক কোনরূপে আমরা রাত্রি এগারটার সময় যথাস্থানে

পৌঁছিলাম। এইবার নৌকায় যাইতে হইবে। এখান হইতে আমাদের বাড়ী সাত ক্রোশ, তবে জলপথে কিছু ঘুরিয়া যাইতে হয়।

সে দিন চতুর্দ্দশী। জ্যোৎস্না অনেকক্ষণ ডুবিয়া গিয়াছে; রাত্রি কিছু অন্ধকার তবে ঘোর নহে। সেই তরল অন্ধকার ভেদ করিয়া তারকারাজি অল্প অল্প কিরণ দিতেছিল। আমরা তখনই নৌকা ছাড়িয়া দিলাম। অনুকূল বাতাস বহিতেছিল, মাঝিরা পাল তুলিয়া দিল। সেই নিশীথরাত্রে, অনন্ত আকাশ-তলে প্রশান্ত ভাগীরথীবক্ষে পালভরা নৌকা তরতর বেগে মুক্ত-পক্ষ কলহংসীর মত হেলিতে ছুলিতে চলিল। আশ্বিনে বর্ষার সে দুর্দ্দমনীয় চাঞ্চল্য নাই, কিন্তু ভাগীরথী এখনও কূলে কূলে পূর্ণ। যৌবনের সে মত্ততা গিয়াছে কিন্তু যৌবন আজিও ঢলঢল। গঙ্গার উভয় কূলের দূরস্থ গ্রামগুলি কুয়াশাচ্ছন্ন বলিয়া বোধ হইতেছিল। গাছপালা সবই ছায়া-ছায়া যেন চিত্রার্পিত। কোথাও বা অদূরে দুই একটা সৌধ-শ্রেণী পড়িয়া আছে; কোন-টীর বা মুক্ত বাতায়নপথে আলো দেখা যাইতেছে। দূরে মাঝি-মাল্লারা সারি গাহিয়া চলিয়াছে, গান বুঝা যায় না, কিন্তু সেই গভীর নিস্তব্ধ রজনীতে সঙ্গীতের সেই শেষ ভাগ বড়ই মধুর শুনাইতেছিল। আর আমার মনে যে সঙ্গীত বাজিতেছিল, তা আরও মধুর।—ক্রমে আমারও তন্দ্রা আসিল। তন্দ্রা স্বপ্নময়, আর স্বপ্ন যে কি-ময় এবং কে-ময় তাহা বলিতে হইবে কি?

কখন প্রভাত হইয়াছিল জানি না। বেলা তিন চারি দণ্ডের সময় মাঝিদের ডাকে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। মাঝিরা বলি-তেছে—"বাবু ঘাটে এসেছি উঠুন।" কথাটা—

কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ।

তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলাম। সঙ্গে যে বালক দুইটী ছিল, তাহারা নৌকা ঘাটে লাগিবামাত্রই লাফ দিয়া ঘাটে উঠিয়াছিল—আমরা তীরে উঠিতে না উঠিতে তারা কতদূর চলিয়া গেল।

গঙ্গার ধার হইতে আমাদের বাড়ী একপোয়া পথ। গ্রামের নীচেই বিল, কিছু ঘুরিয়া সেই বিল-পথে গেলে প্রায় দুই ঘণ্টা লাগে। আমরা ততটা ঘুরিতে প্রস্তুত ছিলাম না।

বালক দুইটী চলিয়া গেলে আমি সেই কিশোরটীকে বলিলাম, "কই উপেন, তুমি যে ওদের সঙ্গে গেলেনা?", সে কোন উত্তর দিল না, কেবল আমার দিকে চাহিয়া একটু হাসিল। সে হাসি ঔদাস্যের। আমি সে ঔদাস্যের কারণ বুঝিলাম। তাহার মত বয়সে আমারও একদিন এইরূপ উদাস ভাব আসিয়াছিল। বাল্যকালে পূজা বলিয়া গৃহ বলিয়া যে একটা দুর্দ্দমনীয় টান থাকে আমোদে যত উৎসাহ থাকে, বয়সে ক্রমে তাহা কমিয়া আসে। কমিতে কমিতে এই কিশোর অবস্থায় যেন একান্তই কমিয়া যায়; তখন কেমন একটা উদাস ভাবে হৃদয় ছাইয়া ফেলে—বাল্যকালের সে সকল আমোদে মন আর মাতে না, সে সব বাঁধনে তেমন টান থাকে না। যেন কি একটা অভাবে কি একটা শূন্যতায় হৃদয় সর্ব্বদা খাঁ খাঁ করিয়া বেড়ায়, পুরাতনের কিছুই আর তাহা পূর্ণ করিতে পারে না। শেষ আর এক নূতন বন্ধন হয়, সে বন্ধনে শিথিল গ্রন্থি সব আবার দৃঢ় হইয়া পড়ে, জগৎ আবার স্নেহময় হইয়া উঠে—শীতের পর বসন্তের উদয় হয়।

উপেনের বয়স সতের আঠার বৎসরের মধ্যে। বলা বাহুল্য সে অবিবাহিত।

জিনিসপত্র বাঁধিয়া মাঝির মাথায় দিয়া আমরা দু'জনে নৌকা

হইতে উঠিলাম। তীর হইতে গ্রাম নজরে পড়িতেছিল। কিছুদূর গিয়াই সম্মুখে দেখিলাম প্রকাণ্ড শস্যক্ষেত্র। সেখান হইতে সেই সুদূরবিস্তৃত, বায়ুহিল্লোলবিধূত শ্যামল শস্যরাজি দেখিয়া মন মুগ্ধ হইল। আমরা সেই শস্যক্ষেত্রের মধ্যস্থ সংকীর্ণ পথ ধরিয়া চলিলাম।

গ্রামে প্রবেশ করিলাম। বর্ষার অবসানে অশথ, বট, আম্র প্রভৃতি বৃক্ষ সকল কেমন সতেজ, তাহাদের শাখায় শাখায় পাতায় পাতায় চিক্কণ যৌবন উদ্ভাসিত। মাঝেমাঝে স্তবকে স্তবকে "রাধাচূড়া" পুষ্পের লোহিত আভা শ্যামল পত্রের অবকাশপথে পড়িয়া মন হরণ করিতেছিল। পুষ্করিণীগুলি কাণায় কাণায় পূর্ণ। কোনটীর বা উভয়পার্শ্বে কদলীবৃক্ষের শ্রেণী বিরাজ করিতেছে, কোথাও বা নানাবর্ণের করবী, দোপাটী এবং শেফালিকা ফুটিয়া দিক আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে।

বাটীতে প্রবেশ করিয়াই পিতৃদেবের দর্শন মিলিল, তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কিছুক্ষণ তাঁহার নিকট বসিলাম—তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিবার পর বাটীর ভিতর গেলাম। একে একে মা, ভগ্নী, পিসিমা, ঠাকুরমাতা প্রভৃতি সকলে আমায় ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন। গুরুজনদের যথারীতি প্রণাম করিলে পর, ভগ্নী একটা মাদুর বিছাইয়া দিলেন—আমি সেখানে বসিলাম। বালকবালিকার দল ছুটিয়া আসিল; কেহ কোলে, কেহ পাশে বসিল। মা খাবার আনিতে গেলেন, আর সকলে কাছে বসিয়া গল্প করিতে লাগিলেন। অনেকদিনের পর, স্নেহের পুত্তলি ও ভক্তির প্রতিমাগুলি দেখিয়া হৃদয় আনন্দে উছলিয়া উঠিল। কিন্তু সত্য কথা লুকাইব না—কথা কহিতে কহিতে মাঝেমাঝে অন্যমনস্কও হইতেছিলাম। আমার চঞ্চল চক্ষু কোন একটি নেপথ্যবর্ত্তিনীর উদ্দেশে ছুটিয়া বেড়াইতেছিল। আর ও একটি উৎসুক দৃষ্টি যে অদূরে

অন্তরালের ছিদ্রপথে ঘনপল্লবচ্ছায়াতলে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল তাহা আমার অন্তর জানিত

জল খাওয়ার পর বন্ধুবান্ধবদের সহিত দেখা করিতে বাহির হইলাম। পূজায় অনেকেই বাটী আসিয়াছেন, একে একে প্রায় উপস্থিত সকলের সঙ্গেই দেখা করিলাম।

বাল্যকালের সেই বাঁধাঘাট, সেই বটগাছ সেই বকুলতলা সকলই দেখিলাম। শৈশবের কত কথা মনে পড়িল—হায়, আজ সে সব দিন কোথায়! আর সেই শৈশবের সেই যে সঙ্গী, তারাই বা আজ কোথায়! কেহ দেশান্তরে, বহুকাল দেখি নাই—কেহ লোকান্তরে, এ জীবনে দেখিবার আশা নাই।

দেখাসাক্ষাতে, আহারে, নিদ্রায়, গল্প গানে সমস্ত দিন কাটিয়া গেল—রাত্রি নয়টার পর আহারাদি করিয়া শয়ন-গৃহে গেলাম। আজ এ পর্য্যন্ত আমার সেই নয়নানন্দদায়িনীর সাক্ষাৎ পাই নাই। বালিকা বা যুবতী বধূর শ্বশুর-গৃহে দিবসে স্বামী-সন্দর্শন বড় কঠিন কথা। গৃহে আসিয়া প্রায় আধ ঘণ্টা শুইয়া রহিলাম। পাতাটী নড়িলে, বায়ু একটু সশব্দে বহিলে উৎফুল্ল হইয়া উঠি, কিন্তু বৃথা আশা। মনে হইতে লাগিল—

"প্রাণে কাঁদি তার তরে,
তবু সে বিলম্ব করে
রমণী নিদয়!"

কাজকর্ম্ম সমাধা করিয়া তাঁর আসিতে এ বিলম্বটুকু হইতেছে তাহা বুঝিয়াও অবুঝ মন চঞ্চল হইয়া উঠিল।

অকস্মাৎ পিছন হইতে কে আমার চক্ষু টিপিয়া ধরিল। কি কোমল স্পর্শ!

আমাদের বাটীতে পূজা হয়। আমরা সকল জ্ঞাতি মিলিয়া

একত্রে পূজা করিয়া থাকি। স্নুতরাং কাহারো ব্যয়বাহুল্য হয় না। বিশেষ এই পূজার জন্য পৃথক জমীর বন্দোবস্ত আছে।

আজ সপ্তমী পূজা। পূজার বাদ্য বাজিয়া উঠিয়াছে। দলেদলে বালকবালিকা "আঙ্গা কাপড়" পরিয়া পূজা দেখিতে ছুটিয়াছে।

সন্ধ্যার পর আরতি। পুরোহিত ঠাকুর যথা সময়ে পঞ্চ প্রদীপ হস্তে আরতি আরম্ভ করিলেন। তাঁহার হস্তের সেই কৌশলময় সঞ্চালন দেখিবার জিনিস বটে। প্রতিমার নিকটে ঘনঘন ধূপধুনা জ্বালান হইতেছিল—উভয় পার্শ্বে সারি বাঁধিয়া চামর-ব্যজন চলিতেছিল, মাঝে মাঝে লাল নীল আলোয় চণ্ডীমণ্ডপ উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছিল। কাঁশরঘণ্টার রবে দিক পূরিয়া উঠিয়াছিল; সঙ্গে সঙ্গে ঢাক ঢোল শানাই বাজিতেছিল। অসংখ্য নর-নারী ভক্তিভরে, একদৃষ্টে প্রতিমা নিরীক্ষণ করিতেছিল। সে সময়ে এ দৃশ্য দেখিতে দেখিতে মনে কেমন একটা পবিত্র ভাব আসিল, ভক্তিভরে হৃদয় পুলকিত হইয়া উঠিল।

পরদিন অষ্টমী পূজা। অন্যবার সন্ধিপূজা গভীর রাত্রে হইয়া থাকে, এবার আরতির সঙ্গে সঙ্গেই সন্ধিপূজার আরম্ভ হইল। আজ পূজার জম-জমাটা আরও কিছু বেশী রকমের।

নবমীর দিন লোকজন খাওয়াইতেই কাটিয়া গেল। তারপর বিজয়া দশমী; বৈকালে প্রতিমা বরণ হইল। আজ গ্রাম ও আশপাশ হইতে অনেক লোক বিসর্জ্জন দেখিতে আসিয়াছে।

আমাদের গ্রামে আরও দুইখানি পূজা হইত। তিনখানি প্রতিমা একত্র গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়া একসঙ্গে বিসর্জ্জন দিতে চলিলাম। [illegible]র প্রান্তেই বিল। সেই বিলে প্রতিমা বিসর্জ্জন দেওয়া হ[illegible] [illegible]ল এখনও জলে পূর্ণ, স্নুতরাং প্রতিমা লইয়া "বাচখেলার" বড় স্নুবিধা। আমরাও নৌকাবিহারের লোভ সম্ব-

রণ করিতে পারিলাম না। প্রকাণ্ড বিল, বিলের একধার হইতে অন্য ধার স্পষ্ট নজর হয় না। চারিদিকে কেবল স্থির জলরাশি, মাঝে মাঝে নিমোজ্জনোন্মুখ গুল্মবৃক্ষাদির শাখা জাগিয়াছে মাত্র। সেই সব শাখায় শাখায় শ্যামল পত্রের অন্তরালে বক সারসাদি বসিয়া আছে। কোথাও বা কলহংসী, কারণ্ডব, চক্রবাকমিথুন প্রভৃতি জলচর পক্ষী সন্তরণ করিতেছিল—সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া তাহারা ঝাঁকে ঝাঁকে কুলায় উদ্দেশে চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার পর বিসর্জ্জন দিয়া—আমরা নৌকা ফিরাইলাম। কূলে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই জ্যোৎস্না উঠিয়াছিল। কৌমুদী-কিরণ-সম্পাতি জলরাশির শোভা দেখিতে দেখিতে আমরা উপরে উঠিলাম। তখন শানায়ে পূরবী রাগিণীতে বিসর্জ্জনের গান গাহিতেছিল—সেই গানের সঙ্গে তখনকার প্রাণের সুর মিলিল।

গৃহে ফিরিতে একটু রাত্রি হইল। তার পর সকল পরিবার একত্র হইয়া সম্বন্ধ অনুসারে প্রণাম, আলিঙ্গন আশীর্ব্বাদ চলিতে লাগিল। শেষ, গ্রামস্থ স্বজাতি, কুটম্ব আত্মীয় সকলের বাটীতে বিজয়ার প্রণাম উদ্দেশে বাহির হইলাম। আজ আর শত্রু মিত্র ভেদ নাই, শত্রু শত্রুতা ভুলিয়া মহাশত্রুকে আলিঙ্গন করিতেছে, আজ সকলের মন যেন শান্তি ও ক্ষমায় পূর্ণ।

আহারাদির পর শয়ন-গৃহে বসিয়া আছি, সহসা গৃহিণী আসিয়া ঢিপ করিয়া একটী প্রণাম করিলেন। নূতন নিয়মে, গৃহিণীকুলের নিকট আর বড় একটা প্রণাম পাওয়া যায় না, তাই প্রথমে একটু বিস্মিত হইয়াছিলাম। বিস্ময়ের প্রথম মুহূর্ত্ত অতীত হইলে প্রতিদানে আমিও আমার কর্ত্তব্য সাধন করিলাম।

আজ পূর্ণিমা। রাত্রে ওপাড়ায় রায়েদের বাটীতে যাত্রা হইবে। স্বভাবতই আমি এখন একটা রাত্রিও নষ্ট করিতে প্রস্তুত

নই। কিন্তু কি করি, বন্ধুবান্ধবদের অনুরোধে ও বিদ্রূপে পড়িয়া যাত্রা শুনিতে যাইতে হইল। রাত্রি বারটা পর্য্যন্ত থাকিয়া শেষ পাশ কাটাইয়া চলিয়া আসিলাম। শয়ন-গৃহের দ্বারে আসিয়া শিকল নাড়িলাম; দরজা খুলিয়া ঠাকুরমাতা বাহির হইলেন। একটু রহস্য করিতেও ছাড়িলেন না। ঘরে গিয়া দেখি গৃহিণী নিদ্রাভিভূতা। বুঝিলাম, কয়েক দিন উপর্য্যুপরি রাত্রি জাগিয়া আজ এই অবকাশে একটু ঘুমাইয়া লইতেছেন। এতক্ষণ ঠাকুর মা তাঁর কাছে ছিলেন, শিকল নাড়ার শব্দ শুনিয়াই তাঁর ঘুম ভাঙ্গিয়াছিল; তিনি আর ইঁহার ঘুম না ভাঙ্গাইয়া দুয়ার খুলিয়া দিয়াছিলেন।

মুক্ত বাতায়ন-পথে পূর্ণচন্দ্রের কিরণ আসিয়া শয্যায় পড়িয়াছিল। আমি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সেই শরৎজ্যোৎস্নার সহিত আমাদের গৃহ-জ্যোৎস্নার মিলন দেখিতেছিলাম।

ছুটির দিন ফুরাইল। আজ রাত্রি দশটার পর আমাকে কলিকাতা রওনা হইতে হইবে।

সমস্ত দিন কোথাও বড় একটা বাহির হইলাম না—মা, পিসিমা, ভগ্নী ইহাদের কাছে কাছেই রহিলাম। সন্ধ্যার পরই আহার করিয়া শয়ন করিতে গেলাম।

আমি যাওয়ার একটু পরেই গৃহিণী উপস্থিত হইলেন। সেই স্বভাবপ্রফুল্ল মুখখানি বড় বিষন্ন।

অন্য দিনের অপেক্ষা দশটা আজ যেন দু'চারি ঘণ্টা পূর্ব্বে বাজিল। বিদায়কালীন মিলন যখন নিবিড়তম তখন কে ডাকিল, "বাবু মাঝি এসেছে।"

একে একে সকলের কাছে বিদায় লইলাম। নৌকায় উঠিলাম। নৌকা ছাড়িয়া দিল।

নিছনি।

৪র্থ এবং ৫ম সংখ্যা সাধনা পাঠে "নিছনি" শব্দের নানা অর্থ দেখিতে পাইলাম। আমাদের এতদ্দেশে প্রাচীন কাল হইতে যেরূপ অর্থে "নিছনি"র ব্যবহার হইয়া আসিতেছে, নিম্নে লিখিতেছি।

"নিছনি" বস্তুবাচক নাম। স্বর্ণমুদ্রা, রৌপ্যমুদ্রা প্রভৃতি, এমন কি মরকতাদি মণিও "নিছনি" রূপে ব্যবহার করা প্রচলিত আছে। পরিবার ও আত্মীয়স্বজনের মধ্যে কাহারও মঙ্গলোদ্দেশে অথবা অমঙ্গল ও অশুভ দূরীকরণার্থে মহিলাগণ নিজ নিজ অবস্থানুসারে পূর্ব্বোক্তপ্রকার মুদ্রা বা মণিরূপ নিছনি দ্বারা নিছাইয়া থাকেন। পিতা জ্যেষ্ঠভ্রাতা প্রভৃতি নমস্য ব্যক্তির দক্ষিণ উরুতে, স্বামীর বাম উরুতে ও পুত্র, কনিষ্ঠভ্রাতা এবং দেবর প্রভৃতি আশীর্ব্বাদপাত্রদের ললাটদেশে উক্তপ্রকার মুদ্রা বা মণি স্পর্শ করাইয়া, তাহা আশ্রিত গ্রহাচার্য্যকে দেওয়ার রীতি আছে। এই নিয়ম বোধ হয়, স্ত্রীলোক দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়া থাকিবে। পুরুষদের এরূপ কার্য্য করিতে দেখা যায় না।

আমরা বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস প্রভৃতির পদাবলী ঐ ভাবেই অর্থ করিয়া থাকি। কোনরূপ গোলযোগ হয় না। যথা :—

তোমার পিরীতে হাম হইনু বিকিনো
মূলে বিকালাঙ, আর কি দিব নিছনি।

ইহার অর্থ—তোমার প্রেমে যখন আমি সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছি, তখন "নিছনি" দিবার আর কিছু অবশিষ্ট নাই, অর্থাৎ তোমার অমঙ্গল দূরীকরণ বস্তুও অবশিষ্ট রাখি নাই।

নিরমল কুলশীল বিদিত ভুবন,
নিছনি করিনু তোমার ছুঁইয়া চরণ।

অর্থ এই—আমার বংশমর্য্যাদা অকলঙ্ক বলিয়া জগতে বিখ্যাত; তোমার চরণ স্পর্শ করিয়া তাহাও "নিছনি" রূপে দিলাম, অর্থাৎ তোমার জন্য আমি সকলই দিতে পারি।

জনৈক পাঠক।
ত্রিপুরা।

প্রথম ভাগ চতুর্থ সংখ্যা সাধনায় প্রকাশিত প্রশ্ন।

বাল্মীকির রামায়ণের টীকাকার রামানুজ ও বৈষ্ণবসম্প্রদায়প্রবর্ত্তক রামানুজ এক ব্যক্তি কি না? "প্রপন্নামৃত" নামক গ্রন্থানুসারে রামানুজ ৯৩৯ শকাব্দে প্রাদুর্ভূত হন। এবং স্মৃতিকালতরঙ্গ মতে রামনুজের আবির্ভাবকাল ১০৪৯ শকাব্দ। উক্ত রামানুজদ্বয় যদি এক ব্যক্তি না হন, তবে তাঁহাদের মধ্যে কোন্ রামানুজ রামায়ণের টীকাকার ও তিনি কোন সময়ের লোক? পুরাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ এ বিষয়ের মীমাংসা করিয়া দিলে বিশেষ বাধিত হইব।

শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর।

—

উত্তর।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সম্পাদিত রামায়ণ পুস্তকে "রামানুজ কৃত টীকা সমেতম্" এই কথা লেখা থাকায় অনেকেই মনে করেন, বেদান্ত ভাষ্যকার ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আচার্য্য রামানুজস্বামী রামায়ণ মহাকাব্যেরও টীকাকার। কিন্তু এই বিষয়ে অনেককে সন্দিহান হইতেও দেখা যায়। আমরাও সন্দেহকারী দলের অন্যতম। রামায়ণটীকাকার আপনাকে যেরূপে পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে তিনি যে রামানুজ নহেন, তাহা স্পষ্টই প্রতীত হয়। তিনি বরাবর সর্গসমাপ্তির শেষে "শ্রীরামীয়ে রামায়ণ-তিলকে" এরূপ লিখিয়া গিয়াছেন। ঐ বাক্যের অর্থ "শ্রীরামেণ প্রোক্তং শ্রীরামীয়ং তস্মিন্" এইরূপ। উহার ভাব্য কথা এই যে, টীকার নাম রামায়ণ-তিলক এবং টীকাকারের নাম শ্রীরাম। শ্রীরাম কি রামানুজ? রামানুজ কেন স্বীয় নামের অর্দ্ধাংশ মাত্র লিখিবেন? প্রারম্ভেও দেখা যায়—

"—রামো রাম প্রবর্ত্তকঃ।
রামায়ণস্য তিলকং কুরুতে রামতুষ্টয়ে॥" *

এই মাত্র কথা আছে। ইহাতেও রাম ব্যতীত রামানুজ শব্দ নাই। আমরা রামানুজের শ্রীভাষ্য ও প্রপন্নামৃত এই দুই গ্রন্থ দেখিয়াছি। তাহাতে তিনি

---

* "রাম প্রবৃত্তিকঃ" পাঠ সঙ্গত। অর্থ রামপ্রসাদ ইঃ ডঃ।

নিজ নাম রামানুজ বে রাম কি শ্রীরাম বলিয়া ব্যবহার করেন নাই। তবে কেন রামায়ণ-টীকা রামানুজের কি না, এ আশঙ্কা জন্মে?

রামায়ণ-টীকাকার শ্রীরাম উত্তরকাণ্ডের টীকায় রামের ব্রহ্মলোক গমন, শুদ্ধ ব্রহ্মরূপ গ্রহণ, এই সকল কথা বলিয়াছেন, বৈকুণ্ঠগমনের কথা বলেন নাই। তাহা না বলাতে, স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, এ রাম বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের আচার্য্য রামানুজ নহে। উত্তরকাণ্ডের শেষ সর্গের ১১ শ্লোকের ব্যাখ্যা শাঙ্কর বেদান্তেরই অনুরূপ। পাঠ করিয়া দেখ, বুঝিতে পারিবে যে, তিলককার শ্রীরাম শাঙ্কর বেদান্তের অনুকারী কি না। বাসিষ্ঠ রামায়ণের টীকাকার আনন্দবোধ ১৭৩৯ সম্বৎ অব্দে বাসিষ্ঠ রামায়ণের টীকা লেখেন। তিনি বলিয়াছেন— "ব্যাখ্যাবাণী ... ... শ্রীমৎ রামমুনীং"—পরমগুরু শ্রীরাম মুনির চরণে নমস্কার করি। আমরা শুনিয়াছি এবং পুস্তকের গায়েও টিপ্পন আছে, ব্যাখ্যা রামায়ণ-ব্যাখ্যা। এতদনুসারে স্থির হইতেছে, আনন্দবোধের পরমগুরু শ্রীরাম কর্ত্তৃকই রামায়ণতিলক নির্ম্মিত হইয়াছে, অনেক পুরাতন রামানুজ কর্ত্তৃক হয় নাই। রামানুজাচার্য্য কুমারপালের কিছু অল্পকাল পরে জন্মগ্রহণ করেন, সে জন্য সম্ভবতঃ তিনি এক্ষণে অন্যূন ৮০৫ বৎসরের প্রাচীন।

তিলককার শ্রীরাম যে কতক ও তীর্থ এই দুই প্রাচীন টীকার সর্ব্বদাই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, তদ্দ্বয়ের অন্যতম অর্থাৎ তীর্থ উপরোক্ত সময়েই প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। এ সংবাদও রামায়ণতিলককার শ্রীরামের রামানুজ অপেক্ষা আধুনিকত্ব প্রতিপন্ন করিতে সমর্থ।

শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ।

ন্মগ্রহণ করিলেই দুঃখ ভোগ করিতে হয়; অতএব দুঃখ নিষ্কৃতি পাইতে হইলে বাসনা ত্যাগ করিয়া কর্ম্মবন্ধন করিয়া নির্ব্বাণলাভের চেষ্টা করিতে হয়। নির্ব্বাণপ্রাপ্তি হলে আর পুনর্জন্মের সম্ভাবনা থাকে না। সেই দুঃখ হইতে পরিত্রাণই বৌদ্ধধর্ম্মের চরম লক্ষ্য।

এই দুঃখ হইতে ত্রাণলাভের জন্য কেন যে, সমস্ত কর্ম ও বাসনা দূর করা কর্ত্তব্য তাহা একরূপ বুঝা যায় কিন্তু কেন যে, সৎকর্ম্ম করিব, পরোপকার করিব এ প্রশ্নের কোন উত্তর দেওয়া হয় নাই। কেবল বলা হইয়াছে বৌদ্ধধর্ম্ম নিষ্ক্রিয় নহে সক্রিয় ধর্ম্ম।

ভাল মন্দ সকল প্রকার কর্ম্মই যে বন্ধন, আমাদের হিন্দুশাস্ত্রে এই কথা বলে।

যাবন্ন ক্ষীয়তে কর্ম্ম শুভং বাশুভমেব বা।
তাবন্ন জায়তে মোক্ষো নৃণাং কল্পশতৈরপি।
যথা লৌহময়ৈঃ পাশৈঃ পাশৈঃ স্বর্ণময়ৈরপি।
তথা বদ্ধো ভবেজ্জীবঃ কর্ম্মভিশ্চাশুভৈঃ শুভৈঃ।

অর্থাৎ কর্ম্ম শুভই হোক্ আর অশুভই হোক্, যে পর্য্যন্ত না ক্ষয় প্রাপ্ত হয় সে পর্য্যন্ত শত কল্পেও মনুষ্যদিগের মুক্তি হয় না। যেমন লৌহময় পাশেও বাঁধা যায়, স্বর্ণ পাশেও বাঁধা যায়, তেমনি শুভাশুভ উভয়বিধ কর্ম্মের দ্বারাই জীব বদ্ধ হইয়া থাকে।

লৌহময় পাশ অপেক্ষা স্বর্ণময় পাশ আম[illegible] বিবেচনা[illegible] [illegible]কারণ, [illegible]ন্ধন ছেদন করিবার ক্ষ[illegible]

[illegible] বাড়িবে, যত[illegible] বা-
[illegible] সাধারণের দুঃ[illegible]

বাসনাও বলবতী হইয়া উঠিবে। এই দুঃখময় অ-
অপূর্ণ মানবসংসারে প্রকৃত সাধুলোকের কর্ম্মই সর্ব্বাে
অধিক।

এই প্রশ্নোত্তরমালাতেও সে কথা একপ্রকার স্বীকার ক-
হইয়াছে। এক স্থলে বলা হইয়াছে, "তিনিই বোধিসৎপদের যা
যাঁহার নৈতিক ও ধর্ম্মবৃত্তির বিকাশ অপর সকল লোক অপেক্ষ
শ্রেষ্ঠ ও পরজন্মে নিশ্চয়ই পৃথিবীতে বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হইবেন
তাঁহার তদ্রূপ অবতীর্ণ হইবার কারণ এই যে, মানবের অজ্ঞা-
নতা জন্ত তাহার প্রতি তাঁহার দয়া এত প্রগাঢ় এবং তাহাকে
দুঃখের কারণ ও দুঃখ হইতে পরিত্রাণের উপায় শিক্ষা দিবা
মঙ্গলেচ্ছা তাঁহার এতই প্রবল যে, তিনি যে পর্য্যন্ত মনুষ্যকে বুদ্ধ
লাভের উপযুক্ত না করিতে পারেন সে পর্য্যন্ত তিনি বারম্বার
ইচ্ছাপূর্ব্বক জন্মগ্রহণ করেন। এইরূপে বুদ্ধত্ব অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া
ধর্ম্মপ্রচারান্তর জন্মচক্রের সীমা অতিক্রম করতঃ পূর্ণমুক্তি পর-
নির্ব্বাণের অবস্থায় গমন করেন।"

যে পর্য্যন্ত একজন জীবও দুঃখভোগ করিবে সে পর্য্যন্ত
দয়ার বিরাম নাই। অতএব দয়াবৃত্তির চর্চ্চা করা যদি বৌদ্ধ-
ধর্ম্মের উপদেশ হয়, তবে বাসনাবন্ধ মোচন করিয়া আশু নির্ব্বাণ-
লাভের কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না। এপদ্ধতি অনুসারে জগ-
তের যাবতীয় জীবের একত্র নির্ব্বাণ ছাড়া নির্ব্বাণের উপায় নাই।
কোন কালে সমগ্র জীবের বুদ্ধপদপ্রাপ্তির আশা আছে কি না
এগ্রন্থে তাহার কোন উত্তর দেওয়া হয় নাই।

...ন্তু, যদি দুঃখনাশই একমাত্র ...
সমুদয় কামনা, সুতরাং সদসৎ স...
আমি জন্মদুঃখ হইতে নিষ্কৃতি প...